হইয়া পড়ে, তখন আমার সেই অস্থিভেদী বিশল্যকরণী প্রবল হইয়া আমার শরীরের সমুদয় ব্যাধি শান্তি করিয়া, আনন্দ-রসে মনকে পরিতোষ করে। তখন এ সকল বিষ-জ্বালা আমার মনে আর প্রবেশ করিতে পারে না। ঐ সমুদয় রিপু এককালে পরাস্ত হইয়া আমার মন হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পলায়ন করে। বিশল্যকরণীর এত গুণ যে হৃদয়ে প্রবেশ মাত্রেই বিপক্ষ পরাস্ত হইয়া যায়। আহা! এমন যে মহারত্ন বিশল্যকরণী, যাহার ঘ্রাণে শরীর ও মনের কুপ্রবৃত্তি রূপ বিষ-জ্বালা সমুদয় জীর্ণ হইয়া অমৃত স্রোতে শরীর মন এককালে পরিপূর্ণ হয়। হায় হায়! এই মহৌষধি না চিনিয়া লোকে নানা প্রকার যন্ত্রণানলে দগ্ধ হয়। আহা একি সাধারণ আক্ষেপের বিষয়! আমরা যে চক্ষু থাকিতেই অন্ধ হইয়াছি, তাহার আর সন্দেহ নাই। লোকে বিবেচনা করে, যে গন্ধমাদন পর্ব্বতে বিশল্যকরণী আছে, সে স্থানে যাওয়া অতি কঠিন কর্ম্ম, আমাদের সাধ্য নাই, আমরা সে বিশল্যকরণী কোথা পাব। আহা কি আশ্চর্য্য! আমাদিগের মনের কি এত ভ্রম! সেই ঔষধের বীজ যে আমাদিগের চিত্তক্ষেত্রে রোপিত রহিয়াছে আমরা তাহার কিছুই জানি না, ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়। আমরা তদ্বিষয়ে যত্নবান না হইয়া নানা প্রকার দুঃখার্ণবে মগ্ন হই। একি আমাদের সাধারণ দুরদৃষ্টের কর্ম্ম! আমাদের হৃদয়-প্রকোষ্ঠে এমন রত্নপূর্ণ রহিয়াছে যে, (আমরা এমন হতভাগ্য) তাহা আমরা খুলিয়া না দেখিয়া দীনদরিদ্রের মত হাহাকার করিয়া দিবারাত্র কাঁদিয়া

বেড়াই, একি সামান্য দুঃখের বিষয়! ভাবিয়া দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমায় যদি মাতৃদত্ত এই মহামন্ত্র ধন না থাকিত, তাহা হইলে আমার যে, কি পর্য্যন্ত দুর্দ্দশা ঘটিত তাহা বলা যায় না। যাহা হউক, কৃপাময়ের কৃপাতে আমার মন সতত প্রেমানন্দেই পরিপূর্ণ আছে। ইহাতেই আমি কৃতার্থ হই। হে দয়াময় দীনবন্ধু! পরম পিতা তোমার যে কত দয়া আমাদিগের উপর স্পষ্ট প্রকাশিত রহিয়াছে, আমরা তাহা দেখিয়াও দেখি না, এবং জানিয়াও জানি না। পিতঃ! তুমি আমাদের এই শরীরের মধ্যে কত অপূর্ব্ব কৌশল করিয়া রাখিয়াছ। আমরা এই শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছি এবং সর্ব্বদা এই শরীর নিরীক্ষণ করিতেছি। কিন্তু আমাদের শরীরের মধ্যে কখন কি প্রকার ঘটনা হইতেছে, তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিতেছি না। হে নাথ দয়াময় তোমার কৌশলের কণিকা মাত্রও আমরা জানিতে পারি না, তাহাতে আবার তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করি। হে নাথ! যে তোমার স্বরূপ নির্ণয় করিতে চাহে, সে নিতান্ত অজ্ঞান, তাহার তুল্য নির্ব্বোধ আর নাই। কিন্তু আমাদের মনে এই কথাটি বড় বিশ্বাস আছে যে, তুমি ভক্তবৎসল। বিশেষ তুমি আপনি বলিয়াছ, যে ভক্ত আমায় মাতাপিতা, ভক্ত আমার প্রাণ। ভক্তের হৃদয় আমার বিশ্রামের স্থান। তোমাকে যে একান্ত মনে ডাকে, তাহার নিকটে তুমি বিনা বন্ধনেই বন্দী হইয়া থাক। যাহা হউক আমার সকল কর্ম্মের মূল কারণ তুমি। আমার মনে যখন যে ভাবের উদয় হয়, তাহা সমুদয়

তুমি জান, তোমার অগোচর কিছুই নাই। তখন আমার মন পুস্তক পড়িবার জন্য ব্যাকুল থাকিত। তখন তুমি এমনি কৌশল করিলে, যে ঐ বাটীতে যে সকল পুস্তক ছিল, আমি সে সমুদয় ক্রমে ক্রমে পাঠ করিতে সমর্থ হইলাম। আমি মনের মধ্যে এই কথাটি ভাবিলে, আমার মনে ভারী আশ্চর্য্য বোধ হয়। যখন আমি লেখা-পড়া কিছু জানি না, তখন আমি যে আবার পুস্তক পড়িতে পারিব ইহা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। বাস্তবিক এমন অবস্থায় লেখা-পড়া শিক্ষা করা, কেবল সেই জগৎপিতার বাঞ্ছাকল্পতরু নামের মহিমা মাত্র। তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক, পরমেশ্বর আমারতো বাঞ্ছাপূর্ণ করিয়াছেন। আমার মন যেমন পুস্তক পড়ার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, তেমনি পুস্তক পড়িয়া পরিতুষ্ট হইয়াছে। ঐ বাটীতে যে কিছু পুস্তক ছিল, ক্রমে ক্রমে আমি সকল পড়িলাম। চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, আঠারপর্ব্ব, জৈমিনিভারত, গোবিন্দলীলামৃত, বিদগ্ধমাধব, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, বাল্মীকি পুরাণ এই সকল পুস্তক ঐ বাটীতে ছিল। কিন্তু বাল্মীকি পুরাণের আদিকাণ্ড মাত্র ছিল, সপ্তকাণ্ড ছিল না।

পরমেশ্বর মনুষ্য জাতির মনের ভাব এই প্রকার করিয়াছেন যে কোন বিষয় হউক না কেন, যদি তাহার যৎকিঞ্চিৎ মাত্র পায়, তাহা হইলে সেটি সম্পূর্ণ পাইতে ইচ্ছা করে; সেটি মনের স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার। ঐ বাল্মীকি পুরাণের আদিকাণ্ড পড়িয়া সপ্তকাণ্ড পড়িবার জন্য নিতান্ত আগ্রহ জন্মিল, কিন্তু ঘরে ছিল না। সেও পল্লীগ্রাম, অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিলাম গ্রামের মধ্যে পাওয়া গেল না। আমার মনও

কোনমতে মানে না, কি করিব, ভাবিতে লাগিলাম। তখন আমার দ্বারকানাথ নামে পঞ্চম পুত্র কলিকাতার কলেজে পড়িত। আমিতো লিখিতে জানি না, যদি আমি তাহাকে পত্র লিখিতে পারিতাম, তাহা হইলে এত চিন্তার কারণ ছিল না। আমি যে পুস্তক পড়িতে পারি, এ কথাটি তখন প্রায় সকল লোকেই জানিতে পারিয়াছিল। আমি পুস্তক পড়িবার জন্য যে প্রকার কষ্ট পাইয়াছিলাম, তাহা সকলে জানিতেন না। পরে সকলে শুনিয়া আমার প্রতি ভারী সন্তুষ্ট হইলেন, আমি ইহা বড় ভাগ্যের কথা বলিয়া মানিয়াছি। আমি পূর্ব্বে অতিশয় ভয় করিতাম, কিন্তু পরে দেখিলাম যে এ বিষয়ে আমার প্রতি কেহ অসন্তুষ্ট হন নাই, বরং আরও ভালই বলিতেন। সে যাহা হউক আমি যদি তখন ঐ পুস্তক একখানি চাহিতাম, তাহা অনায়াসে পাওয়া যাইত। কিন্তু আমি প্রাণান্তেও কাহার নিকট আমাকে দাও বলিতে পারি নাই। দাও এই কথাটি আমার নিকটে ভারী কঠিন কর্ম্ম বোধ হইত। এখন বরং ছেলেদিগকে দুই একটি কথা বলিতে পারি।

যাহা হউক আমার মন সেই সপ্তকাণ্ড বাল্মীকি পুরাণের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার সেই ছেলেটি কলিকাতা হইতে বাটীতে আইল। আমি তাহার নিকট বলিলাম দ্বারি! তোমাদের ঘরে অনেক পুস্তক আছে কিন্তু সপ্তকাণ্ড নাই। তাহার একখানা পাইলে বড় ভাল হয়। দ্বারি বলিল মা! আমি কলিকাতা যাইবা মাত্রই আগে আপনাকে সেই পুস্তক পাঠাইয়া দিব। অনন্তর সে কলিকাতা

গেল। আমার মন ঐ পুস্তক পাওয়ার জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছিল, যেন আমার শরীরে কত রোগ উপস্থিত হইয়াছে। মনের এই প্রকার যন্ত্রণা হইতে লাগিল।

কতক দিবস পরে ঐ পুস্তক আসিয়া বাটীতে পৌঁছিল। আমি প্রাপ্তিমাত্রেই স্পৃহা আহ্লাদিত হইয়া হাতে লইয়া দেখিতে লাগিলাম। তাহার ছাপার অক্ষর অতি ক্ষুদ্র। একন্য ও পুস্তক আমার পড়া হইল না। তখন আমার মনে যে কত কষ্ট হইল, তাহা বলা যায় না। আমি ঐ পুস্তক হাতে লইয়া পরমেশ্বরের প্রতি অনুযোগ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। আর মনের মধ্যে বলিতে লাগিলাম, হে দীননাথ! এ পুস্তকখানি যদিও এত দিবস পরে তুমি আমাকে দিলে, তাহাও আমার পক্ষে নিষ্ফল হইল। আমি এত যত্নে এ পুস্তক আনিলাম, কিন্তু পড়িতে পারিলাম না। এই কথা বলিয়া চক্ষের জলে আমার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে আবার আমার ভারী লজ্জা হইতে লাগিল, ছি ছি আমি কাঁদি কেন? আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, তুমি কাঁদ কেন? তাহা হইলে আমি কি উত্তর করিব। এই ভাবিয়া চক্ষের জল মুছিয়া বলিতে লাগিলাম কেন, আমি কাঁদি বা কি জন্য? পূর্ব্বেতো আমি লেখাপড়া কিছুই জানিতাম না, তাহা আমাকে কে শিখাইয়াছে। যিনি সদয় হইয়া দয়া করিয়া আমাকে এত দিয়াছেন, তাঁহার যদি কৃপা থাকে, তবে ও পুস্তকও আমি অনায়াসে পড়িতে পারিব।

এই ভাবিয়া কান্না সম্বরণ করিয়া মনঃস্থির করিলাম, পরে ঐ পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু পরমেশ্বরের

অনুগ্রহে ঐ ছাপার অক্ষর অতি অল্প দিবসের মধ্যেই আমার বেশ পড়া চলিতে লাগিল। পূর্ব্বে আমি ভাবিয়াছিলাম, এ ছাপার লেখা, এ লেখা বুঝি আমি পড়িতে পারিব না। পরে দেখিলাম, সে কালের হাতের লেখার অপেক্ষা ছাপার অক্ষরই উত্তম। আমি যেমন অল্প জানি, তাহাতে আমার পক্ষে ছাপার লেখাই ভাল। তদবধি আমি সকল প্রকারের অক্ষরই কিছু কিছু পড়িতে পারিতাম। কিন্তু লেখার বিষয়ে আমি কখন মনোযোগ করি নাই, এজন্য লিখিতেও জানি না, মধ্যে মধ্যে এই কথাটি আমার মনে বিষম যন্ত্রণাদায়ক হইত। আমি সর্ব্বদা পরমেশ্বরের নিকটে এই বলিয়া রোদন করিতাম, হে পরমেশ্বর! তুমি আমাকে সকল বিষয়ে প্রায় এক মত ভালই রাখিয়াছ। সংসারের বিষয়ে লোকের যাহা যাহা আবশ্যক, আমাকে তাহা তুমি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সকলই দিয়াছ। কিন্তু এই কথাটি আমার মনে ভারী আক্ষেপের বিষয় যে, আমি লিখিতে জানি না। তুমি আমাকে লিখিতে শিখাও। পরমেশ্বরের নিকট দিবারাত্র এই বলিয়া কাঁদিতাম। এই অবস্থায় আমার অনেক দিবস গত হইয়াছে। আমি যে আর লিখিতে শিখিব, আমার মনে এমন ভরসাও ছিল না।

পরমেশ্বরের ইচ্ছায় দৈবাৎ এক দিবস আমার মধ্যম পুত্র কিশোরীলাল বলিল মা! আমরা যে পত্র লিখিয়া থাকি, তাহার উত্তর পাই না কেন? আমি বলিলাম আমি পড়িতে পারি, এজন্য তোমাদের পত্র পড়িয়া থাকি। আমিতো লিখিতে জানি না, সেজন্য উত্তর দেওয়া হয় না। তখন

সে বলিল মা! ও কথা আমি শুনি না, মায়ের পত্রের উত্তর না পাইলে কি বিদেশে থাকা যায়। পত্রের উত্তর দিতেই হইবে। এই বলিয়া কাগজ, কলম, দোয়াত, কালী সমুদয় সংগ্রহ করিয়া আমাকে দিয়া সে কলিকাতায় পড়িতে চলিল। আমি বড় বিপদেই পড়িলাম, আমি মোটেই লিখিতে পারি না, কেমন করিয়াই বা লিখিব। আমি যে একটু একটু পড়িতে পারি, তাহা হাতে লিখিতে পারি না। তবে যদি অনেক চেষ্টায় দুই এক অক্ষর যেমন তেমন করিয়া লেখা যায়, সংসারের কাজের জন্য লিখিতে অবকাশ পাওয়া যায় না। ছেলেও বার বার মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া গিয়াছে, উত্তর না দিলেই চলিবে না। আমি ভাবিতে লাগিলাম, কি করিব, একি দায় আমার যে বিষম সঙ্কট হইল।

এই প্রকার ভাবিতেছি; ইতিমধ্যে হটাৎ এক দিবস কর্ত্তাটির সান্নিপাতিকের পীড়া হইয়া চক্ষের পীড়া হইয়া উঠিল। তখন ঐ চক্ষের চিকিৎসা করিতে কর্ত্তাটি গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর গেলেন। সে সঙ্গে আমাকেও যাইতে হইল। আমার পঞ্চম পুত্র দ্বারকানাথের বিষয় কর্ম্মের স্থান কাঁঠালপোতা, আমাদের সেই বাসাতে থাকা হইল। সেই স্থানে আমাদিগের ছয় মাস থাকিতেও হইল। তখন বাটীর অপেক্ষা আমার কাজের অনেক লাঘব হইল। সেই অবকাশে যৎকিঞ্চিৎ লেখা আমার হস্তগত হইল।

আমার লেখাপড়া বড় সহজ কষ্টে হয় নাই, যাকে বলে কষ্ট। সে লেখাপড়ার কথা আমার মনে উদয় হইলে ভারী আশ্চর্য্য বোধ হয়। আমাকে যেন পরমেশ্বর নিজে

হাতে ধরিয়া শিখাইয়াছেন। নতুবা এমন অবস্থায় লেখাপড়া কোন মতে সম্ভবে না। যাহা হউক আমি যে এক আদটি অক্ষর শিখিতে পারিয়াছি, তাহাতেই আমার পরম সৌভাগ্য। বোধ হয়, এরূপ একটু না জানিলে আমিতো সম্পূর্ণ পরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতাম, তাহার সন্দেহ নাই। এ নিজস্ব পরমেশ্বর আমাকে যাহা দিয়াছেন, আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট আছি! তিনি আমার প্রতি এত দয়া করিয়াও ক্ষান্ত হন নাই। আর দিবারাত্র সম্পদে বিপদে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। আহা! যিনি এমন পরম বন্ধু, এমন প্রাণের সুহৃদ, আমি এমন অধমা যে একবারও তাঁহাকে স্মরণ করি না। আমার বাসনায় ধিক, আমার মনুষ্য জন্মে ধিক, আমার এ ছার জীবনেও ধিক, আমি কেন এ পাপদেহ ধারণ করিয়াছি। আমার মানব জন্ম মিথ্যা!

দশম রচনা।

ওহে মন ভোলা, হইয়া বিভোলা,
ভুলিয়া রয়েছ কিসে।
বিভবেতে পশি, মধুর কলসী,
জারিছে দুষ্কৃতি বিষে॥
যদি পড়ে ধসি, কেন রৈলে বসি,
তখন কি হবে বল।
ভাঙ্গিল এ মেলা, আর নাহি বেলা,
পসার তুলিয়া চল॥
ভবের বাজারে, বাণিজ্যের তরে,
এসেছিলে তুমি বটে।
ঘিরিয়া সঘনে, আছে দস্যুগণে,
কখন কি জানি ঘটে॥
মহাজনের মাল, রাখ এত কাল,
হিসাব করিতে হবে।
হুসিয়ারে থেকো, তিলে তিলে দেখ,
নিতে না পারে ঐ সবে॥
বাছিয়া কিনিতে, দর বুঝে নিতে,
দিবস হইল শেষ।
রাসসুন্দরী মত, যে আছে কিঞ্চিত,
লয়ে চল নিজ দেশ॥

আহা মরি মরি! জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! আপনার শরীর ও মনের বিষয়ে ভাবিয়া দেখিলে মন এককালে অধৈর্য্য ও অবশ হইয়া পড়ে। আমার এই শরীর এই মন এই কাঠামেই কয়েক প্রকার হইল। আমার শরীরের অবস্থা এবং মনের ভাব পূর্ব্বে কি প্রকার ছিল, এবং এখনি বা ক্রমে ক্রমে কি প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা নির্ণয় করিয়া বলা বড় সহজ কর্ম্ম নহে; একটু কঠিন ব্যাপার বলিতে হইবে। বিশেষতঃ আমার শক্তিতে তাহার যে সম্পূর্ণ ঘটনা সমস্ত নির্ণীত হইয়া উঠিবে, এমন ভরসাও করি না। তবে কোনমতে যৎকিঞ্চিৎ বলিতেছি—

আমার পাঁচ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত, শরীরের অবস্থা, মনের ভাব কি প্রকার ছিল, তাহা আমি যদিও বলিতে পারি না, তথাপি বোধ হয়, তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম, আমার তাহার কিছুমাত্র স্মরণ নাই।

পরে যখন সাত আট বৎসরের ছিলাম, তখন আমার মনে জ্ঞানের অঙ্কুর হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই। তখন আমার মনের বড় জড়তা ছিল। এবং শরীর অতি সুকোমল বলহীন ছিল, এমন কি, আপন শরীর পালনের ভারও অন্যের উপরে ছিল। নিজের শক্তিতে কোন কাজ হইত না। এই প্রকার অবস্থায় কতক দিবস গত হইয়াছে।

পরে বার বৎসর বয়ঃক্রমের সময় আমার বিবাহ হইয়াছে। সেই হইতে আমি আমার পিত্রালয়ের অতুল স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে পরাধীনা হইয়াছি। তখন আমার বাল্যভাব এককালে পরিবর্ত্তিত হইল, তখন আমি নূতন বৌ হইলাম। আমার অলঙ্কারাদি যে কিছু লাগে, তাহা

সমুদয় নূতন হইল, আমিও নূতন বেশ ধারণ করিয়া, নূতন বৌ হইয়া, নূতন নূতন ব্যবহার সমুদয় শিখিতে আরম্ভ করিলাম। ঐ বার বৎসর পরে এদিকে আর ছয় বৎসর পর্য্যন্ত আমি সম্পূর্ণ নূতন বৌই ছিলাম।

ইতিমধ্যে পরমেশ্বর আমার শরীরে যেখানে যে প্রকার প্রয়োজনীয় বস্তু লাগিবে, তাহার সমুদয় সরঞ্জাম দিয়া, আমার শরীরতরণী সাজাইয়া দিয়াছেন। আহা কি আশ্চর্য্য! কৌশলের বালাই লয়ে মরি। আমার শরীর হইতে এত গুলা ঘটনা হইতেছে, আমি তাহার কারণ কিছুই জানি না। হায়! একি ভেল্কীবাজী না কি, না আমি স্বপ্ন দেখিতেছি? এই প্রকার আমার মনের ভাব হইল, বাস্তবিক আপনার শরীর নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে পরমেশ্বরের প্রতি বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মে, তাঁহাকে আর দূরে অন্বেষণের আবশ্যক হয় না। সহজ চক্ষে স্পষ্টরূপে বেশ দেখা যাইতেছে। আমাদের সেই দয়াময়, দয়ার সাগর পরম পিতা আমাদিগকে সকল দিয়াছেন বলিয়া তিনি কি দূরে রহিয়াছেন, এমন নহে, সঙ্গে সঙ্গে আছেন। যখন ঐ সংসার সমুদ্রের তরঙ্গে আমার এই শরীরতরণীর বাইজ হইয়াছিল, তখন সেই বিপদ-ভঞ্জন আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, ভয় নাই, ভয় নাই, বলিয়া সাহস প্রদান করিতেন। এমন কি, আমি যখন যে কাজ করিতাম, আমার নিশ্চয় জ্ঞান হইত, যেন পরমেশ্বর আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। যখন আমি ১৮ বৎসরের হইলাম, তখন আমার প্রথম সন্তানটি হয়, ক্রমে ক্রমে আমার বার সন্তান হয়।

এই ১৮ বৎসর বয়স অবধি আর পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, আমার শরীরের অবস্থা, মনের ভাব প্রায় এক মতই ছিল। সংসারের কাজকর্ম্মে ও ছেলেদের লালন পালনে মনে ভারী মত্ততা থাকিত।

অনন্তর আমি ক্রমে প্রাচীন দলে পড়িলাম বটে, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত সংসারের প্রতি মনের ভাবের কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই। পরে এ দিকে আর কএক বৎসর আমি যদিও সম্পূর্ণ সংসারী ছিলাম, তথাপি পূর্ব্বাপেক্ষা আমার মনে বিলক্ষণ ঔদাস্ত ভাবের উদয় হইতে লাগিল। তখন শরীরের অবস্থাও ক্রমে লম্বমান হইতে লাগিল। এই অবস্থায় সাতাস আটাস বৎসর প্রায় গত হইয়া গিয়াছে। তখন আমার তিনটি পুত্রের বিবাহ হইয়াছে, তিনটি পুত্রবধূও হইয়াছে। ছোট কন্যাটির একটি পুত্র হইয়াছে, তখন আমি পতি, পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা আর বাটীর লোক জন ও প্রতিবাসিনীগণ এই সকলকে লইয়া মহা আহ্লাদিত হইয়া প্রফুল্লচিত্তে কাল-যাপন করিয়াছি। কিন্তু পরমেশ্বর তোমার ভঙ্গী বুঝা যায় না, তুমি সকলি করিতে পার।

সাপ হয়ে কাঁমড়াও, ওঝা হয়ে ঝাড়।
হাকিম হয়ে হুকুম দাও, পেয়াদা হয়ে মার॥

১২১৬ সালে চৈত্র মাসে আমার জন্ম হইয়াছে, আর এই বহি ১২৭৫ সালে যখন প্রথম ছাপা হয় তখন আমার বয়ঃক্রম উনষাইট বৎসর ছিল। এই ১৩০৪ সালে আমার বয়স অষ্টাশী বৎসর। এত কাল পর্য্যন্ত আমার শরীরের অবস্থা, মনের ভাব, এবং পরণ-পরিচ্ছদ ইত্যাদি যে কিছু ছিল, তাহা সমুদয়

পরিবর্ত্তিত হইয়া এখন তাহার বিপরীত অবস্থা হইল। লোকে বলে, মনুষ্যের অবস্থা সকল কাল সমান ভাবে যায় না। কিন্তু দেখিলাম, সে কথাটি বড় মিথ্যা নহে, যথার্থই বটে।

খণ্ডিতে না পারে কেহ ললাটের অক্ষর।
কিবা ব্রহ্মা কিবা বিষ্ণু কিবা মহেশ্বর॥

পরমেশ্বরের নির্ব্বন্ধ যেটি সেটি হবেই হবে। যাহা হউক, আমার এত কাল পরে সকল পথ অতিক্রম করিয়াও কুলের অতি নিকটে আসিয়াও পাড়ী জমিল না।

"মৃত্যুর অধিক ফল মস্তক মুণ্ডন।"

পরমেশ্বর আমার মস্তক মুণ্ডন করিয়াছেন। ঐ ১২৭৫ সালে ২৯ মাঘী শিবচতুর্দ্দশীর দিবসে, আড়াই প্রহর বেলার সময় কর্ত্তাটির মৃত্যু হয়। আমার শিরে স্বর্ণমুকুট ছিল; কিন্তু এতকাল পরে সেই মুকুটটি খসিয়া পড়িল। যাহা হউক, আমি তাহাতে দুঃখিত নহি, পরমেশ্বর আমাকে যখন যে অবস্থায় রাখেন, সেই উত্তম। ঐ ১২৭৫ সালে অগ্রহায়ণ মাসের *প্রথম দিবসে পুরোহিত গুণনিধি চক্র-বর্ত্তীর মৃত্যু হয়।

সে যাহা হউক, আমার এতকাল প্রায় একপ্রকার অবস্থাতেই দিবস গত হইয়াছিল। এক্ষণে শেষ দশাতে বৈধব্য দশা ঘটি-য়াছে। কিন্তু একটি কথা বলিতেও লজ্জা বোধ হয়, শুনিতেও দুঃখের বিষয় বটে।

শত পুত্রবতী যদি পতিহীনা হয়।
তথাপি তাহাকে লোকে অভাগিনী কয়॥

বাস্তবিক যদি আর কিছুও না বলে, তুমি বিধবা হই-

য়াছ, এটি বলিতেই চাহে। সে যাহা হউক আমার এই শরীর এই মন এই কাঠামেই দেখিতে দেখিতে কয়েক প্রকার হইল, অনবরত আমার শরীরের মধ্যে খোদকারী হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! আমি ইহার কিছুই জানিতে পারি না। সেই কারিকরকে শত শত ধন্যবাদ দেই।

একাদশ রচনা।

ধন্য ধন্য তুমি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
ও চরণে অধিনীর এই নিবেদন॥
এসেছি ভারতবর্ষে অতি হর্ষ মনে।
হরিষে বিষাদ নাথ হয় কি কারণে॥
মণিহারা ফণী প্রায় বিষাদিত হিয়া।
ক্ষণে ক্ষণে ওঠে প্রাণ চমকিয়া চমকিয়া॥
ভকতবৎসল প্রভু তুমি অন্তর্যামী।
দীনবন্ধু নাম সত্য জানিলাম আমি॥
শত শত অপরাধে আমি অপরাধী।
অপরাধ মার্জ্জনা কর হে দয়ানিধি॥
কি আর বলিব নাথ সব জান তুমি।
সংসার বাসনা কভু নাহি করি আমি॥
না চাহি তনয় বন্ধু নাহি চাহি ধন।
বাসনা আমার তব পদে থাকে মন॥
অসার সংসার মাত্র সার ধর্ম্মপথ।
তাহাতে রাসের যেন পূরে মনোরথ।

হে পিতঃ করুণাময়! হে বিশ্বব্যাপি জগৎপালক! হে পরমেশ্বর! হে অনাথ-নাথ! তোমার এ অনাথা তনয়াকে পাপ তাপ হইতে পরিত্রাণ কর, হে দয়াময় [illegible]র সাগর! হে পতিতপাবন দীনবন্ধু! এ অধিনী কন্যার প্র[illegible] কিঞ্চিৎ

করুণা প্রকাশ কর। হে দুর্ব্বলের বল! হে সর্ব্বশক্তিমান! হে নির্দ্ধনের ধন! হে বিপত্তরণি! তোমার এ দুর্ব্বল সন্তানকে ভবতরঙ্গ হইতে পার কর। তোমা ছাড়া থাকিতে পারি না। হে নয়নের নয়ন! হে নয়নরঞ্জন! তুমি আমার নয়নান্তর হইও না, আমার নয়ন যেন তোমার ঐ মোহন রূপে সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকে। হে মনের মন মনোধিপতি! আমার মনের সঙ্গে সম্মিলিত হও। আমার মন যেন তোমা ছাড়া তিলার্দ্ধ না থাকে। হে জীবনের জীবন! হে জীবনকান্ত আমার হৃদয়াসনে তুমি আসীন হও, আমার হৃদয় যেন তোমার মধুময় আলিঙ্গনে পরিপূর্ণ হইয়া প্রেমস্রোতে ভাসিয়া থাকে। এখনও আমার সেই শরীর সেই কাঠাম আছে, কিন্তু পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখন তেমন নাই, আমি যে কর্ম্ম ইচ্ছা করিতাম, সেই কর্ম্মেই লাগিত। এখন আর শরীর-তরণী তেমন চলে না। এক্ষণে আমার সেই শরীরের অবস্থা কি প্রকার হইয়াছে, তাহাও কিঞ্চিৎ বলি;

চলিতে শকতিহীন জীর্ণ কলেবর।
স্থানে স্থানে হচ্চে বাঁকা লম্বিত অধর॥
লোলচর্ম্ম ক্রমে হ'ল শিরে শুক্ল কেশ।
গলিত হয়েছে দন্ত ছাড়ি গণ্ড দেশ॥
সর্ব্বাঙ্গের ভঙ্গী কি বলিব আমি আর।
দিনে দিনে হচ্চে মম বিকৃতি আকার॥

যা হউক এখন আমার সেই শরীর থাকা ভার। এক্ষণে শরীর ক্রমে ক্রমে জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। পরমেশ্বর সে সকল জিনিষ পত্র দিয়া আমায় শরীর-তরণী সাজাইয়া

দিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা ক্রমে ক্রমে আমার শরীর হইতে খুলিয়া লইতেছেন। এক্ষণে দেখিতেছি, সেই জীবনের জীবন আমার হৃদয়-সিংহাসনে চরণ দোলাইয়া বসিয়াছেন। এক্ষণে বোধ হইতেছে, যে সকল বস্ত্র দিয়া তিনি আমার শরীর সাজাইয়া দিয়াছিলেন, সেই সমুদয় জিনিষ পত্র একবারে খুলিয়া লইয়াই তিনি গাত্রোত্থান করিবেন। সে যাহা হউক, আমি এই একটি আশ্চর্য্য কথা ভাবিতেছি। আমি ভারতবর্ষে আসিয়া এত কাল যাপন করিলাম এবং এখন পর্য্যন্তও আছি। ইহার মধ্যে আদ্য অন্ত সকল কথা আমি পৃথক পৃথক করিয়া প্রকৃষ্টরূপে মনে করিয়া দেখিলাম যে আমাকে কেহ কখন মধুর বাক্য বৈ কটুবাক্য বলে নাই। কি আমার অন্তরঙ্গ, কি বৈরঙ্গ, কিম্বা প্রতি-বাসিনী, কি কোন দেশস্থ লোক, কেহ যে কখন কোন প্রকারে আমার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল, এমন আমার স্মরণ হইল না। আমি এই জন্য পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দেই। পরমেশ্বর আমার প্রতি সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে অকপটে দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল লোকে যে আমাকে এত স্নেহ এবং এত যত্ন করে, ইহাতে আমার এই জ্ঞান হয় যেন পরমেশ্বর ইহাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন। এই কথাটি মনে ভাবিয়া আমার মন ভারী আহ্লাদিত হয়। এই আহ্লাদে প্রায় এত দিবস আমার গত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হইয়া সংসারের পূর্ব্বের ব্যবহার সমুদয় ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্মে প্রবৃত্ত বলিলেও হয়। যাহা হউক জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! আমার এই শরীর

হইতে যে কত আশ্চর্য্য কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, অপর আর কি হইবে, তাহা পরমেশ্বর জানেন।

এক্ষণে আমার পরিবারের মধ্যে সকলের উপরে কেবল আমি আছি। আমার উপরে আর কেহই নাই, সকলে পরলোকে গিয়াছেন। এক্ষণে আমারও পরলোকে যাওয়ার সময় হইয়াছে, কিন্তু কোন্ দিবস সেই পরলোকে যাইতে হইবে, তাহার কিছুই নির্ণয় নাই। মৃত্যুর দিবস নির্ণয় না জানাতেই লোকে অনেক বিষয় ঠ'কে যায়, যদি মনুষ্যেরা মৃত্যুর সময়-নির্ণয় জানিতে পারিত, তাহা হইলে বোধ হয়, মনুষ্যের এমন দুর্দ্দশা ঘটিত না! এক প্রকার কার্য্যসিদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু পরমেশ্বর মনুষ্য মাত্রকেই সর্ব্বাপেক্ষা আশা বৃক্ষটি প্রবল করিয়া দিয়াছেন। সেই আশার আশাতেই মনুষ্যের দিবারাত্র গত হইতেছে। আমি সেই অক্ষয়-ফলের আশাতে এতকাল পর্য্যন্ত এ জীবন যাপন করিতেছি, হে ফলাধিপতি! তুমি আমার জন্য কি ফল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছ। আমি শেষকাণ্ডে না জানি কি ফলই বা প্রাপ্ত হই। সেই কথাটি মনে ভাবিয়া আমার শরীর মন একবারে আচ্ছন্ন ও অবশ হইয়া পড়ে। হে নাথ পতিতপাবন! তোমার ঐ পতিতপাবন নামে যেন কলঙ্ক না হয়। তুমি এমন প্রবল আশা দিয়া নিরাশ করিতে কখনই পারিবে না। আমার এ আশা তোমাকে পূর্ণ করিতে হবেই হবে। বিশেষ আমার মনে এই প্রকার একটি দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে যে, তুমি আমাদিগকে সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে সমুদয় বস্তু প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছ, সেটি বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। বাস্তবিক

আমাদিগকে সকল সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াও তুমি ক্ষান্ত থাকিতে পার নাই। আমাদিগের জীবনে মরণে, সম্পদে বিপদে সকল সময় অহরহঃ তুমি সঙ্গে সঙ্গেই আছ; এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছ। যখন তোমার এমন অতুল দয়া আমাদের প্রতি অর্পিত রহিয়াছে, তখন কি আর অন্য কথা আছে। তুমি এমন প্রবল আশা দিয়া আবার নিরাশ করিবে, এমন কখনই সম্ভব হইতে পারে না। বিশেষতঃ তুমি অনাথের নাথ নির্দ্ধনের ধন এবং বিপদের তরণী, দুর্ব্বলের বল, এই সকল নামটি তোমার জাজ্বল্যমান প্রকাশ পাইতেছে। তাহা কি তুমি এই ক্ষুদ্র বিষয়ের জন্য অন্যথা করিতে পারিবে, কখনই নহে। হে বিশ্বব্যাপি সর্ব্বশক্তিমান পরম দেবতা! তোমার অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই। এই চরাচরে যে কিছু পদার্থ আছে, সে সমুদয় তোমারি সৃষ্টি। তুমি ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছাতেই সৃষ্টি চলিতেছে। আবার ইচ্ছা হইলে এই সৃষ্টি কটাক্ষে তুমি বিনাশ করিতেও পার। কিন্তু তোমার পক্ষে এই কর্ম্ম নিতান্ত অসম্ভব। তুমি কোন মতে এ কর্ম্ম করিতে পারিবে না। বাস্তবিক আমরা যদি তোমার নিকট অতিশয় ঘৃণাস্পদ কর্ম্মও করি, কিম্বা শত শত অপরাধেও অপরাধী হই, তত্রাপি তুমি তোমার কোল হইতে আমাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিতে পারিবে না। আমরা যেখানে থাকি, সেখানেই তুমি আছ।

দ্বাদশ রচনা।

নাথ হে জানাব কত, দীনের দিনতো গত,
মনের আক্ষেপ রৈল মনে।
কত সাধনার কর্ম্ম, মনুষ্য দুর্ল্লভ জন্ম,
গত হ'ল নিদ্রায় সঘনে॥
হায় রে দারুণ মোহ, কেন বা করিলি দ্রোহ
নিদ্রা হ'তে না দাও চেতন।
তোর সনে কিবা বাদ, কেন ঘটাও এ বিবাদ,
শত্রুতা করিলি কি কারণ॥
এ শত্রুতা তোমা সনে, স্বপ্নেও না ভাবি মনে,
জানি তুমি পরম বান্ধব।
পাতিয়া মায়ার জাল, মুগ্ধ রাখ এত কাল,
এখন তা ব্যক্ত হ'ল সব॥
এসে পিতা দয়াময়, ডেকে ডেকে ফিরে যায়,
রেখেছিলি এ মোহ বন্ধনে।
এদেহে পেলাম নারে, আর কি পাইব তাঁরে,
ধিক্, ধিক্, ধিক্, এ জীবনে॥
সদানন্দ মহানন্দ পেয়ে যার দল।
অবধান করিবে ছাড়িয়া তার ফল॥
ভদ্র কুলোদ্ভবা আমি বিশেষ অবলা।
বিষয় কর্ম্মেতে মগ্ন সদা মনভোলা॥
নাহি জানি ভাল মন্দ মতামত যত।
পিঞ্জরেতে বন্দী আছি বনপশু মত॥

মনের আক্ষেপ হেতু লিখি কোন মতে।
বলিব কি বর্ণজ্ঞান শূন্য এ জগতে॥
সাধু জন নিকটেতে করি পরিহার।
দোষ ক্ষমা করি গুণ করিবে প্রচার॥

দেশে বিদেশে, জলে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্ব্বতে যেখানেই থাকি না কেন, সেখানেই তোমারি রাজ্য, তোমার কোলেই আছি। কোন মতে তোমার কোল ছাড়া হব না। কিন্তু আমাদের যেমন কর্ম্ম, তুমি তাহার উপযুক্ত ফল বিধান করিতেছ। আমি ভারতবর্ষে আসিয়া এত কাল গত করিয়াছি, কিন্তু তোমার অনুগ্রহে বড় মন্দ অবস্থায় দিবস গত হয় নাই, এক প্রকায় ভালই রাখিয়াছিলে। এক্ষণে আমার শেষ কাণ্ডে না জানি কেমন দুর্দ্দশা বা করিয়া দাও, তাহা তুমি জান। যাহা হউক পিতা তুমি আমাকে যখন যে অবস্থায় রাখিবে তাহাই উত্তম। আমি যেন তোমার নামানন্দেই পরিপূর্ণ থাকি, আমার এই প্রার্থনা।

মন তোরে বুঝাব কত, নিজে তুমি বলে হত,
সেনাপতি হ'য়ে এলে রণে।
হইলে হইত জয়, রিপু ছিল পরাজয়,
মুক্তহস্তে এসেছিলে কেনে॥
তব ব্যবহার দেখে, সহজে হাসিবে লোকে,
রণভয়ে পলাইছ দূরে।
হায় কি বিষম দায়, সমর না হতে জয়,
জয়পত্র বাঁধ কেন শিরে॥

———

ত্রয়োদশ রচনা।

জগতের প্রাণধন, বিশ্বব্যাপি নিরঞ্জন,
বিশেষ প্রকাশ তুমি মানব-হৃদয় হে।
তব গুণ প্রকাশিত, নাহি স্থান অবিদিত,
তব দয়া ভুবন-ভূষিত দয়াময় হে॥
পাষাণ দুর্ম্মতি যারা, ফিরে শান্তি হয়ে হারা,
তবু তব প্রেমনীর করে বরষণ হে।
তুমি চৈতন্যের মূল, নাহি তব সমতুল,
অকূলে পড়েছি নাথ, আমি অচেতন হে॥
ভবের তরঙ্গ-রঙ্গ, হেরিয়ে কাঁপিছে অঙ্গ,
এ সময়ে কোথা প্রভু দয়ার সাগর হে।
ডাকিতেছি সকাতরে, প্রভু প্রেমরত্নাকরে,
দুখিনীরে দুখার্ণবে, পতিত না কর হে।
দেবঋষি বেদে কয়, তুমি দীনদয়াময়,
দয়াময় নামে যেন কলঙ্ক না হয় হে।
নামের কলঙ্ক আর, ভয়ান্বিত অবলার
রক্ষা হেতু ওহে নাথ করহ উপায় হে॥

স্বপ্ন-বিবরণ।

——o——

পরমেশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে যাহা কিছু দেখা যায় তাহা সমুদয় ভাবিয়া দেখিলে, বোধ হয়, যেন সকলি স্বপ্ন। বাস্তবিক স্বপ্নে লোকে নানা প্রকার আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া থাকে। যখন জাগিয়া দেখে, তখন কিছুই নাই। সেই প্রকার পৃথিবীতে যত কিছু দেখা যায়, দেখিতে দেখিতেই নাই। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলি স্বপ্ন তুল্য বোধ হয়। তন্মধ্যে এই একটি কথা আছে, স্বপ্ন দুই প্রকার, জাগ্রত স্বপ্ন, আর নিদ্রিত স্বপ্ন। এক দিবস রাত্রিযোগে জগন্নাথ মিশ্র নিদ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিতেছেন, যে তাঁহার পুত্র নিমাঞীচাঁদ যেন মস্তক মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া নবদ্বীপ ছাড়িয়া গিয়াছেন। এই স্বপ্ন দেখিয়া জগন্নাথ মিশ্র নিদ্রাবেশেই, নিমাঞী নিমাঞী বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। ঐ স্বপ্নে তিনি যে প্রকার দেখিয়াছিলেন, বাস্তবিক সেই সমুদয় ঘটনা সত্য হইল।

সূর্য্যবংশীয় রাজা দশরথসুত ভরত যখন তাঁহার মাতুলালয়ে ছিলেন। তখন রামচন্দ্র বনগমন করাতে রাজা দশরথ সেই শোকে প্রাণ পরিত্যাগ করেন এবং রামচন্দ্রের সঙ্গে জানকী লক্ষ্মণও যান। বস্তুতঃ রাজা দশরথের মৃত্যু হইয়াছে এবং রাম লক্ষ্মণ সীতা তিন জনই বনবাসে গিয়াছেন। আর

অযোধ্যায় সকল লোক হাহাকার করিয়া রোদন করিতেছে। ভরত মাতুলালয়ে থাকিয়া নিদ্রাবেশে এই সকল স্বপ্ন দেখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে জাগিয়া উঠিলেন। কি আশ্চর্য্য! ভরতের স্বপ্নে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, প্রাতে উঠিয়া শুনিলেন, সেই প্রকার সমুদয় ঘটনা ঘটিয়াছে।

একদা সেইরূপ আশ্চর্য্য একটি স্বপ্ন আমিও দেখিয়াছিলাম। তাহা বিশেষ করিয়া বলিতেছি। আমার ২১ বর্ষ বয়স্ক তৃতীয় পুত্র প্যারীলাল বহরমপুর-কালেজে পড়িত। আমি বাটী আছি। আমার সেই ছেলেটি বহরমপুরে পড়িতে গিয়াছে। সে সেই স্থানেই আছে। ইতিমধ্যে এক দিবস নিদ্রাবেশে আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, যেন আমার প্যারীলাল কাহিল হইয়া নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, এক কালে যেন আসন্ন কাল উপস্থিত হইয়াছে। আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, যেন আমিও সেই স্থানে দাঁড়াইয়া আছি। এই প্রকার দেখিতে দেখিতে পরে দেখিলাম, তাহার যেন মৃত্যু হইল। তখন তাহাকে মাটীতে শোয়াইয়া এক খানা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিল। আমি যেন সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া এ সকল দেখিতেছি। কিন্তু আমার শরীর মন স্বপ্নাবেশেই ঐ সকল কাণ্ড দেখিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অবশ হইয়া পড়িল। আমি মাটীতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। এই প্রকার দেখিতে দেখিতে আবার দেখিলাম, যেন আমার প্যারীলালকে লইয়া গঙ্গার ঘাটে যাইয়া দাহ করিতে লাগিল। আমি যেন সেই সঙ্গে সঙ্গেই আছি। অগ্নির চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেন কাঁদিয়া বেড়াইতেছি। তখন আমার

প্রাণ কি পর্য্যন্ত যে ব্যাকুল হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে যেন, আমি ঐ চিতার অগ্নির মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়ি, কিন্তু তাহা পারিতেছি না। দাহনের পরে দেখিলাম, সকলে যেন চিতায় সংস্কার করিয়া বাটীতে চলিয়া গেল। আমি যেন সেই স্থানে গঙ্গার চরের উপরে পড়িয়া, প্যারীলাল! প্যারীলাল! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি, আর কাঁদিতেছি।

কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, এক খানা ছোট নৌকা যেন গঙ্গার মধ্য দিয়া আসিতেছে। সে নৌকা খানার উপরে ছৈ টৈ কিছু নাই। এক জন লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আর এক জন লোক ঐ নৌকা খানা বাহিয়া আসিতেছে, আমি কাঁদিতে কাঁদিতে একবার তাকাইয়া দেখি, যেন, আমারি প্যারীলাল নৌকার উপর দাঁড়াইয়া আছে। এতক্ষণ আমি এত কান্না কাঁদিয়াছি যে, আমার চক্ষের জলে সকল গা যেন কাদাময় হইয়া গিয়াছে। আমি যেন তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখিতে লাগিলাম। আমি যে পারে এতক্ষণ ছিলাম, এক্ষণে যেন সে পারে নাই, আমি যেন গঙ্গার ওপারে গিয়াছি। ঐ নৌকা খানাও যেন গঙ্গা পার হইয়া আসিতেছে। আমি ঐ নৌকার উপরে আমার প্যারীলালকে দেখিয়া, কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম, তাহা এক মুখে বলা দুষ্কর। আমার শরীরে যেন তখন কত বল হইল। আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া, প্যারীলাল বলিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তখন আমি যেন পাগলিনীর প্রায় হইয়াছি। পরে ক্রমে ক্রমে ঐ নৌকা আসিয়া কূলে লাগিল। তখন আমি আমার

প্যারীলালকে দেখিয়া পূর্ব্বের ঐ সকল কথা স্মরণ করিয়া কত প্রকার খেদোক্তি করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিলাম। আমার প্যারীলাল যেন আমাকে অত্যন্ত বিপদে পতিত দেখিয়া মহাদুঃখে অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি যেন সম্পূর্ণ উন্মত্ত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উচ্চৈঃস্বরে প্যারি আয় রে! বলিয়া ডাকিতেছি, কিন্তু প্যারীলাল তাহাতে কোন উত্তর দিতেছে না। অনেকক্ষণ পরে গঙ্গার চরের উপরে আমার নিকটে আসিয়া অতি মলিনবদনে মৃদুস্বরে বলিল, মা পুথী শুনিবেন? আমি আমার প্যারীলালের মুখের কথা শুনিয়া এবং আমার প্যারী জীবিত আছে দেখিয়া যেন এককালে স্বর্গের চন্দ্র হাতে পাইলাম। ঐ স্বপ্নাবেশেই আমি মহা পুলকিত মনে উঠিয়া প্যারীলালকে কোলে ঝাঁপটিয়া ধরিয়া বলিলাম, কোথা পুথী হইতেছে, চল, আমি শুনিব। প্যারীলাল বলিল, তবে আমার সঙ্গে চলুন, এই বলিয়া প্যারীলাল আমার আগে আগে যাইতে লাগিল। আমি তাহার পাছে পাছে চলিলাম। এই প্রকার যাইতে যাইতে দেখিলাম, সম্মুখে যেন একটা রাজার বাড়ী দেখা যাইতেছে। আমরা ক্রমে ক্রমে যাইয়া, সেই বাটীর মধ্যে উপস্থিত হইলাম। সে বাটীতে দেখিলাম, কত উত্তম উত্তম দালান ও কোঠা রহিয়াছে। তাহাতে নানাপ্রকার চিত্র-বিচিত্র দ্রব্য সকল ঝলমল করিতেছে। আর একটি সুদৃশ্য দালান দেখিলাম। সেই দালানটির মধ্যে উত্তম এক খানি সিংহাসন প্রস্তুত রহিয়াছে। তাহার চতুর্দ্দিকে কত লোক যে বসিয়া রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। বাস্তবিক সেটা

যেন বিচারালয়, এই প্রকার আমার বোধ হইতে লাগিল। সে যাহা হউক, প্যারীলাল আমাকে একবার মাত্র বলিয়াছিল মা পুথী শুনিবেন, আমার সঙ্গে চলুন। এই কথাটি ভিন্ন আমাকে আর কিছুই বলে নাই। আমি প্যারীলালকে পাইয়া যেন কত হারান ধন পাইলাম। এই প্রকারে যৎপরোনাস্তি সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া, প্যারীলালের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। তখন প্যারীলাল আমাকে সেই আঙ্গিনাতে রাখিয়া, দালানের মধ্যে ঐ সিংহাসনের উপরে উঠিয়া বসিল। আমার পানে আর একবারও ফিরিয়া তাকাইল না। তখন আমি যেন সেই দালানের সম্মুখে, আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছি, আর প্যারীলাল আইস বলিয়া ডাকিতেছি। আমি যেস্থানে আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, সেই স্থান হইতে আমি প্যারীলালকে বেশ দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু আমি যে এত কাঁদিতেছি, আর এত প্রকার খেদ করিতেছি, প্যারীলাল তাহাতে কিছুই উত্তর দিতেছে না।

আমি এই প্রকার স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জাগিলাম। আমি জাগিয়াও যেন নিদ্রাবেশে স্বপ্নে কাঁদিতেছি। জাগিয়াও আমার শরীরে যেন সেই প্রকার ভাব রহিয়াছে। ঐ স্বপ্নে আমি এত কান্না কাঁদিয়াছি যে, জাগিয়া দেখি যে, আমার চক্ষের জলে কাপড় এবং বিছানা সকল ভিজিয়া গিয়াছে। আর আমি মুখে কথা কহিতে পারিতেছি না, আমার মনপ্রাণ এমনি অস্থির এবং ব্যাকুল হইয়াছে, যেন আমার বুকের মধ্যে ধড়পড় করিতেছে। তখন আমি মনে মনে আমার মনকে কত প্রকার সান্ত্বনা করিতে লাগিলাম, আবার

মন কিছুতেই শান্ত হইল না। পরে আমি সেই তারিখটি লিখিয়া রাখিলাম।

তখন আমার এই প্রকার ব্যাকুলভাব দেখিয়া, বহরমপুরে লোক পাঠাইয়া সংবাদ আনীত হইল। আমি স্বপ্নে প্যারীলালের মৃত্যুর বিষয়টি যে প্রকার দেখিয়াছিলাম, অবিকল সেই প্রকার সমুদয় ব্যাপার ঘটিয়াছে। সেই দিবসে, সেই সময়ে, সেই প্রকার অবস্থায় আমার প্যারীলালের মৃত্যু হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! আমি নিদ্রাবেশে স্বপ্নে দেখিয়া, কুস্বপ্ন বলিয়া যাহা মুখে বলিতে পারি নাই, বাস্তবিক তাহা প্রত্যক্ষ সত্য হইয়া গিয়াছে।

মনের অলৌকিকতা।

ওরে আমার মন! তুমি কি সত্যই আমার মন, আমার সর্ব্বস্ব তোমার হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে। তোমার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া একবার আহ্লাদ-সাগরে মগ্ন হই, আবার বিষাদে অঙ্গ জর্জ্জর হইয়া যায়। তুমি কি আমার শত্রু কি মিত্র তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। মন! তুমি আমার মনি মুখে বলি বটে, কিন্তু কর্ম্মের দ্বারা দেখিতে পাই, তোমার অসীম শক্তি, তুমি পলকে এই পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া আসিয়া থাক, তোমার সঙ্গে অন্য কাহার তুলনা হয় না।

বাস্তবিক আমাদের মন কি আশ্চর্য্য বস্তু! এমন উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই দেখা যায় না। এক দিবস আমার মনের মধ্যে অতি আশ্চর্য্য একটি ঘটনা হইয়াছিল, সেই ঘটনাটি বিশেষ করিয়া বলিতে হইল।

অন্তরে স্পষ্ট দর্শন!

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত রামদিয়া গ্রামে আমাদের বাটী। আর ঐ জেলার মতালগে বেলগাছির থানা আছে। রামদিয়া হইতে বেলগাছির থানা প্রহর খানেকের পথ অন্তর। এক দিবস আমার বড় ছেলে বিপিনবিহারী কোন কার্য্যোপলক্ষে ঘোড়ায় চড়িয়া সেই বেলগাছির থানায় গিয়াছে। আমি রামদিয়ার বাটীতে আছি। আমি বাটীতে থাকিয়া দেখিতেছি। এ সকল স্বপ্ন দেখিতেছি তাহা নহে, জাগিয়া আছি, রাত্রি হয় নাই। প্রাতঃকালে দণ্ডচারি বেলার সময়ে মনের মধ্যে দেখিলাম, যেন বিপিন ঐ বেলগাছির থানার নিকটে গিয়া ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়া গেল। পড়িয়া যেন এককালে মূর্চ্ছিত প্রায় হইল। ইহা দেখিয়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী লোকেরা আসিয়া বিপিনকে ঘিরিল।

বিপিনের ঐ বিপদ দেখিয়া বাল-বৃদ্ধ সকল লোক হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল, আর কেহ বা বুকে সান, কেহ বা মুখে জল, কেহ বা বাতাস করিতে লাগিল। আমি বাটীতে থাকিয়া এই সমুদয় ঘটনা বেশ স্পষ্টরূপে দেখিতে লাগিলাম, আমি এক একবার আমার মনকে ধমকাইয়া বলিতে লাগিলাম, ছি ছি মন! তুমি এমন অমঙ্গলের কথা বলিও না! বিপিন ঘোড়া হইতে পড়িবে কেন? আমার বিপিন ভালই আছে। আমার মনকে আমি নানাপ্রকারে বুঝাইতে লাগিলাম। মনকে বারণ করিয়াই

বা কি হইতে পারে, শুধু মন ত বলিতেছে না, আমি মনের মধ্যে ঐ সকল ঘটনাগুলা যে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছি। কেবল মন কেন, লোকেও যেন সেই স্থানে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, আমিও সেই প্রকার সমুদয় ব্যাপার দেখিতেছি। সে স্থানে যত লোক রহিয়াছে, আমি আমার মনের মধ্যে সে সকলের সঙ্গেই বিপিনকে সেই অবস্থায় দেখিতেছি।

এই প্রকার দেখিতে দেখিতে দেখিলাম, কয়েকজন লোক বিপিনকে ধরিয়া থানার ভিতরে লইয়া গেল। ঐ থানার ভিতরে লইয়া একখানা কেদারার উপর বসাইল। বিপিন এমন কাতর হইয়াছে, যে সে কেদারাতে বসিতে পারিল না। তখন একটি ছোট ঘরের মধ্যে লইয়া শোয়াইয়া রাখিল। আমি দিবাভাগে বাটীতে সমুদয় সংসারের কাজ করিতেছি, আর আমার মনের মধ্যে এই প্রকার ঘটনাগুলা জাজ্বল্যমান দেখিতেছি। ঐ সকল দেখিয়া অন্তঃকরণ ভারী ব্যাকুল হইল। তখন আমি আমার মনের কথা মুখে প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলাম। আজি আমার মন কেন এমন অমঙ্গলের কথা বলিতেছে। শুনিয়া কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, কেন, তোমার মন আজি কি বলিতেছে। তখন আমি বলিলাম, বিপিন যেন ঘোড়া হইতে পড়িয়া অতিশয় কাতর হইয়াছে, আমার মনের মধ্যে আমি এই প্রকার দেখিতেছি। আমার এই কথা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন, তুমি মনের মধ্যে যাহা ভাবিতেছ, তাহাই দেখিতেছ, বিপিন কুশলে আছে, কোন চিন্তা নাই। ইহাদিগের এই সকল সান্ত্বনাবাক্যে আমার মন কোন মতে সান্ত্বনা মানিল না। পরে ক্রমে ক্রমে যত

বেলা শেষ হইতে লাগিল, তত দেখিতে লাগিলাম, বিপিনকে যেন ঐ ঘোড়ার উপরে বসাইয়া দুই দিকে দুই জন লোক ধরিয়া রহিল, বিপিন ঘোড়ার উপরে বসিতে পারিল না। পরে দেখিলাম, একজন লোক পাল্কী খুজিয়া বেড়াইল, কিন্তু পাল্কী না পাইয়া একজন বলবান লোক বিপিনকে কোলে করিয়া বাটীতে আনিতে লাগিল। আমি উহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে সকল পথ দেখিতে দেখিতে আইলাম। এই প্রকার আমি মনের মধ্যে দেখিতে লাগিলাম। এ রাত্রি নহে দিবস, স্বপ্নও নয়, আমি জাগিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতেছি।

এই প্রকারে আমার মনে ভারী কষ্ট হইতে লাগিল। ছেলেটি শারীরিক কুশলে এখন বাটীতে পৌঁছিলেই বাঁচি। এই প্রকার দেখিতে দেখিতেই রাত্রি হইল। তখন আমি বিষণ্ণ-বদনে গৃহের দ্বারে বসিয়া রহিলাম। উহারা বাটীর নিকটে যখন আইল, উহাদিগকে দেখিয়া কুক্কুর গুলা ডাকিয়া উঠিল। তখন পর্য্যন্ত আমি দেখিতেছি। পরে যখন বাহির বাটী হইতে বাটীর মধ্যে বিপিনকে কোলে করিয়া আনিল, তখন আমি আর কিছুই দেখিতে পাই নাই। এমন কি ও সকল কথা আমার একবারেই বিস্মৃতি হইয়া গেল। আমি সমুদয় কথা ভুলিয়া গেলাম।

ইতিমধ্যে ঐ লোক বিপিনকে পাঁথালি-কোলা করিয়া বাটীর মধ্যে আঙ্গিনাতে আসিয়া বলিল, কোথা রাখিব? তখন আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম, ও কি আনিল? উহাদের সঙ্গে এক ছোঁড়া খানসামা গিয়াছিল। সে আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহাকে

জিজ্ঞাসা করিলাম, ও কিরে! ওরা কি আনিয়াছে? সে বলিল, মা ঠাকুরাণী! উহার কোলে বড় বাবু। আমি বলিলাম, বড় বাবু আবার কোলে উঠিয়াছে কেন? সে বলিল, আমাদের বড় বাবু ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়া মাজা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। ঘোড়াতে উঠিতে পারিলেন না, এবং পাল্কীও পাওয়া গেল না, এজন্য তকি সরদার কোলে করিয়া আনিয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি দেখিতে গেলাম। ঘরে বিছানা করিয়াছিল, বিপিন দ্বার হইতে ছেঁচুড়ি দিয়া আসিয়া শুইয়া পড়িল। তখন আমি গিয়া বিপিনের নিকটে বসিলাম। তখন অন্যান্য অনেক লোক আইল, এবং বাটীর সকলে মহা ব্যস্ত হইয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বিপিনের সঙ্গে যত লোক ছিল, তাহারা সকলে বলিতে লাগিল, এবং বিপিন নিজেই আদ্য অন্ত সকল কথা বলিল। সকলে শুনিয়া মহাদুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল কথা সত্যই সফল হইয়াছে, বিপিনের মুখে শুনিয়া এককালে অবাক হইলাম। কি আশ্চর্য্য! আমি সকল দিবস মনের মধ্যে যে যে ঘটনা দেখিয়াছি, বিপিন প্রত্যক্ষে সে সমুদয় কথা বলিতেছে।

বিপিন যে প্রকারে ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়াছিল, যে প্রকারে ঐ গ্রামের লোক বিপিনের বিপদ দেখিয়া হাহাকার শব্দে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া, সুস্থ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল, সে প্রকারে থানার ভিতরে লইয়া গিয়া এক ছোট ঘরে শোয়াইয়া রাখিয়াছিল, সেই সকল ব্যাপার আমি যেরূপ দেখিয়াছিলাম, বিপিনও তাহাই বলিল। ফলতঃ আমি সমস্ত দিবস

মনের মধ্যে সে সকল কাণ্ড দেখিয়াছিলাম, সেই প্রকার সমুদয় কাণ্ড ঘটিয়াছে, প্রত্যক্ষে শুনিলাম। এই ব্যাপার আমি মনের মধ্যে স্পষ্টরূপে দেখিয়াছি, কি আশ্চর্য্য! এই কথাটি মনে ভাবিয়া আনন্দ রসে আমার চক্ষের জল ঝর ঝর করিয়া পড়িতে লাগিল। আমার চক্ষের জল দেখিয়া সকল লোক আমাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। ঐ সকল লোক মনে করিল; আমি ছেলের জন্যই কাঁদিতেছি। বাস্তবিক সে কান্না আমার ছেলের জন্য নহে, পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া কাঁদিতেছি। রাত্রি নহে দিবস, স্বপ্ন নয় আমি জাগিয়া রহিয়াছি; তবে আমি কি প্রকারে বাটীতে থাকিয়া সকল ঘটনা জাজ্বল্যমান দেখিলাম; ইহার পর আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে, পরে ছেলের কষ্ট দেখিয়া বিষাদে অঙ্গ জর্জ্জর হইল। সে যাহা হউক, আমার মনের ভাব গতিক দেখিয়া আপনি বিস্ময় মানিলাম।

আমি আর একটি আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়াছি। সে কথাটিও তবে বলি।

মৃত্যু-কল্পনা।

এই পৃথিবীতে যত লোক দেখিতেছি, তাহার অধিকাংশ লোকেই মৃত্যুর নামে অতিশয় ভয় করিয়া থাকে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভয়ের কারণ কিছুই নাই। লোকে না বুঝিতে পারিয়া মৃত্যুর আশঙ্কায় সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকে। মৃত্যুতে যে কিছু মাত্র ভয় নাই, আমি তাহা বিলক্ষণরূপে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। আমি তাহা এ জন্মে আর ভুলিব না।

এক দিবস আমার জ্বর হইয়া নিতান্তই কাহিল হইয়া পড়িয়াছি। এমন কাহিল হইয়াছি যে, এককালে আমার যেন আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে। আমি এক খান চৌকীর উপর শুইয়া রহিয়াছি। ইতিমধ্যে আমার এককালে শরীর যেন অবশ হইয়া গেল। তখন আমি মনে মনে করিলাম, আমি খাটের উপর হইতে নীচে নামিয়া শুই। কিন্তু আমার হাত পা এমন অবশ হইয়াছে যে, আমি কত প্রকার চেষ্টা পাইলাম, কোন মতে নাড়িতে পারিলাম না। আমি কিছু মাত্র অজ্ঞান হই নাই। আমার মনের মধ্যে সকল কথা যুটিতেছে, কিন্তু মুখে কিছু বলিতে পারিতেছি না। আমার জিহ্বা এককালে অবশ। তখন আমার সকল ছেলেই প্রায় ছোট ছোট, কেবল দুইটি ছেলে একটু বড়। সেই দুটি ছেলে আমার দুই পাশে বসিয়া মা মা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে, আর কাঁদিতেছে। আমি অজ্ঞান হই নাই, একবার ভাবিতেছি, ছেলেরা কাঁদিতেছে, আমি উত্তর দিই না কেন? কিন্তু আমার জিহ্বা অবশ হইয়াছে, কথা কহিতে পারিলাম না। মনে মনে সকল কথাই বলিতেছি, কিন্তু কাজে কিছুই হইতেছে না। আমি দক্ষিণ দ্বারী ঘরে খাটের উপর শুইয়াছিলাম, চক্ষু মেলিয়া তাকাইয়া দেখিলাম, ঘর দ্বার সকল লালবর্ণ হইয়াছে। এই প্রকার কিছুক্ষণ পরে, আমি আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না, সকলই একবারে অন্ধকারময় হইল। তখন আমি চক্ষু বড় বড় করিয়া তাকাইলাম, সকলে গেল গেল বলিয়া আমাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল। ঐ সময়ে আমার কি প্রকার হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। তখন আমি

সকল লোককে বেশ দেখিতে লাগিলাম। আমাকে ধরিয়া বাহিরে আনিতেছে, তাহাও আমি বেশ দেখিতেছি। আমার এই চক্ষু মুদ্রিত রহিয়াছে, তাহা পর্য্যন্ত আমি দেখিতেছি। আমাকে যখন ঘর হইতে বাহিরে আনিল, তখন আমার মাথাটী উহাদিগের হাতে হইতে ঝুলিয়া পড়িল। তখন সেই স্থানে আর একটি লোক দাঁড়াইয়াছিল, সে লোকটি তাড়াতাড়ি গিয়া দুই হাত দিয়া আমার মাথাটী ধরিল, তাহাও আমি বেশ দেখিতেছি। পরে আমাকে লইয়া আঙ্গিনার মাটীতে শোয়াইল। কি আশ্চর্য্য! আমি আপনি মরিয়াছি, আবার আপনি কি প্রকারে সকল দেখিতেছি। তখন আমার চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া সকলে মহাশব্দ করিয়া কান্না আরম্ভ করিল। আমার বড় ছেলেটি আমার এক পাশে বসিয়া হাটুর মধ্যে মাথা চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল, আর তাহাকে ধরিয়া তাহার পিসী কাঁদিতে লাগিল। আমার মেজো ছেলেটি মাটীতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। আমার আর ছেলেগুলি কাঁদিতেছে বটে, কিন্তু তাহারা ছোট ছোট, তাহাদিগকে লোকে কোলে করিয়া রাখিয়াছে। বাটীর কর্ত্তাটি ঘরের দ্বারে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মোলো না কি, ভবে বাক। আর ঐ আঙ্গিনাপোরা লোক, তাহারা সকলেই কাঁদিতেছে। আমাকে ঐ আঙ্গিনাতে মাটীতে শোয়াইয়া রাখিয়াছে। ঐ বাটীর গোমাস্তা ঠাকুর হরিমোহন সিক্‌দার কখনও ঐ বাটীর মধ্যে আসিতেন না, এবং আমিও তাঁহাকে দেখি নাই। সেই ঠাকুরটি তখন আমার এক পাশে বসিয়া একবার মাথায় হাত দিয়া দেখিতেছেন, একবার বুকে হাত, একবার মুখে হাত

দিয়া নাড়িয়া দেখিতেছেন, আর কাঁদিতেছেন। আর বলিতেছেন, হায় হায় কি হইল, মা আমাদের ছেড়ে গেলেন। ঐ প্রকারে তিনিও কাঁদিতেছেন। আর কর্ত্তাটি হরিমোহন বলিয়া এক একবার ডাকিতেছেন, আর তাঁহার চক্ষে দর দর করিয়া জল পড়িতেছে, তাহাও আমি দেখিতেছি। কি আশ্চর্য্য! সকল ঘটনাই আমি দেখিতেছি, আর আমার নিজের দেহ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাও আমি দেখিতেছি। আমার চক্ষু মুদ্রিত রহিয়াছে, তথাপি আমি এই সকল ব্যাপার স্পষ্ট দেখিতেছি। তখন জ্ঞান হইতেছে, যে আমি ইহাদিগকে সান্ত্বনা করি, আমার জন্য সকলে এত কষ্ট পাইতেছে, কিন্তু সেটি পারিতেছি না। কি জন্য যে পারিতেছি না, তাহাও বুঝিতে পারি না। এই অবস্থায় কিঞ্চিৎ কাল গত হইল। বস্তুতঃ আমার যে কি হইয়াছে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

অনন্তর আমার চৈতন্য হইল। তখন বোধ হইল, যেন আমি নিদ্রা হইতে জাগিলাম, আমার শরীর বেশ সবল হইল, আমি মুখেও কথা কহিতে পারিলাম, হাত পা গুলাও আমার বশ হইল। আমি দেখিলাম, মাটীতে শুইয়া আছি। — তখন বলিলাম, আমাকে বাহিরে আনিয়াছ কেন? আমার মুখের কথা শুনিয়া এবং আমাকে সজ্ঞান দেখিয়া সকলে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, ঘরের মধ্যে ভারী গরম হইয়াছিল, এজন্য তোমাকে বাহিরে বাতাসে আনা হইয়াছে, এই বলিয়া সকলে আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া পরে ঘরে লইয়া গেল। সে যাহা হউক, আমি আপনি মরিয়া আপনি এ প্রকার সমুদয় ঘটনাগুলা কেমন করিয়া দেখিলাম। কি আশ্চর্য্য!

আমি আপনি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করি। বাস্তবিক আমার নিকটে এ বিষয়টি বড় আশ্চর্য্য-জনক। কিন্তু লোকের নিকট বলিতে আমার কিছু লজ্জা বোধ হয়। কেহ পাছে মনে করেন, এ কথা বিশ্বাসের যোগ্য নহে, এ মিথ্যা কথা। বাস্তবিক আমি যথার্থ বলিতেছি, আমি যাহা সত্য দেখিয়াছি, তাহাই বলিলাম।

চতুর্দ্দশ রচনা।

তুমি জগতের পিতা জগজ্জননী।
জগতে তোমারে সবে দিচ্চে জয়ধ্বনি॥
পশু পক্ষি জীব জন্তু স্থাবর জঙ্গম।
যথাশক্তি পালিতেছে তোমার নিয়ম॥
তব কৃপাবলে জ্ঞান পেয়ে যত নরে।
কেন তব আজ্ঞা তারা শিরেতে না ধরে॥
তাই বলি ধিক্ ধিক্ মানব সকল।
পশুর অধম হ'লে পেয়ে জ্ঞানবল॥

প্রকাশ্য ভূত দৃষ্টি।

লোকে বলে ভূত নাই, ভূত আবার কেমন! আমিও তাহাই ভাবিতাম, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; যথার্থই ভূত আছে। এক দিবস আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, বোধ করি সেইটাই ভূত হইতে পারে।

এক দিবস আমি বেলা প্রহর খানেকের সময় স্নান করিতে যাইতেছি। আমাদের বাটীর দক্ষিণদিকে একটা বাগান আছে। সেই বাগানে প্রবীণ প্রবীণ তেঁতুল গাছ আছে। আমি স্নান করিতে যাইব, ইতিমধ্যে ঐ বাগানের মধ্যে গিয়া সেই তেঁতুল গাছের তলায় দাঁড়াইয়াছি। ঐ তেঁতুল গাছের সম্মুখে একটা বাবলা গাছ আছে; সেই গাছের একটা ডাল একদিকে

হেলিয়া পড়িয়াছে। সে স্থানে অধিক জঙ্গল নাই, দুই একটা ছোট ছোট গাছ আছে মাত্র। দিবাভাগে আমি যেমন ঐ গাছের দিকে তাকাইয়াছি, অমনি দেখিলাম, সেই গাছের হেলিয়া-পড়া ডাল খানির উপরে একটা কুকুর শুইয়া রহিয়াছে। সে কুকুরটাকে যেন ঠিক মানুষের মত দেখাইতেছে। ঐ গাছের সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া কুকুরটার পেটটা রহিয়াছে; আর ঐ গাছের দুইদিকে কুকুরটার হাত পা গুলা ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ঐ হাত পায় বেশ রাঙ্গা শাঁকা ঝল মল করিতেছে। আমি দেখিয়া একবারে অবাক হইয়া, এক দৃষ্টে ঐ কুকুরের পানে চাহিয়া রহিলাম। আর আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, একি আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিতেছি! গাছের উপরে কুকুর শুইয়া রহিয়াছে, ইহাইত আশ্চর্য্য, আবার কুকুরের হাতে শাঁকা ঝলমল করিতেছে। কুকুরের হাতে শঙ্খ, এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার কাহার কখনও দেখা দূরে থাকুক, কেহ শুনেও নাই। আমি ঘণ্টা খানেক পর্য্যন্ত একদৃষ্টে সেই কুকুরের দিকে তাকাইয়া থাকিলাম। কুকুরটা একভাবে রহিয়াছে, আমি বেশ করিয়া নিরীক্ষণ করিলাম। আর আমি মনের মধ্যে ভাবিতে লাগিলাম, যে এমন আশ্চর্য্য কাণ্ডটা আমি একা দেখিলাম, অন্য কেহই দেখিল না। এই ভাবিয়া আমি একবার পিছের দিকে পলক খানেক ফিরিয়া চাহিয়াছি, অমনি ফিরিয়া দেখিলাম, আর কিছুই নাই। তখন আমি সেই গাছের নীচে যাইয়া পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়া দেখিলাম, সে কুকুরটা ত নাই। সে সময়ে সে স্থানে সেটা ভিন্ন অন্য পশু, পক্ষী, জীব, জন্তু, কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। দিবা-

ভাগে আমি বেশ স্পষ্টরূপে দেখিলাম, এত বড় কুকুরটা চক্ষের পলকে কোথা মিশাইয়া গেল, গাছের পাতাটাও নড়িল না। আমি অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, কিন্তু কিছুই না দেখিয়া আমি বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলাম। সকলের নিকট ঐ কুকুরের বিবরণ সমুদয় বলিলাম। শুনিয়া কেহ বলিলেন, সেটা ভূত ; কেহ বলিলেন, মিছা কথা, ধাঁদা দেখিয়াছ, কেহ বলিলেন, এ কথা কখন মিথ্যা হইবেক না, সেটা ভূতই যথার্থ। এই প্রকার সকলে বলিতে লাগিল। যাহা হউক, আমি যাহা দেখিয়াছি, বাস্তবিক সেটা ভূত, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু দিবসে এ প্রকার ভূত দেখিলে লোকের নিকট অতি আশ্চর্য্য বোধ হয়।

যাহা হউক যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলা হইল। এই আমার ৬০ বৎসরের বিবরণ যৎকিঞ্চিৎ লিখিত থাকিল।

আমার নাম মা, আমার পিত্রালয়ে যে নাম ছিল, তাহাতো অনেক কাল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বিপিনবিহারী সরকার, দ্বারকানাথ সরকার, কিশোরীলাল সরকার, প্রতাপচন্দ্র সরকার, এবং কন্যা শ্যামসুন্দরী আমি ইহাদিগেরি মা! এক্ষণে আমি সকলেরি মা।

আমার জীবন-বৃত্তান্ত এই পর্য্যন্তই লিখিত হইল। অপর বৃত্তান্ত প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইলে লিখিত হইবেক।

পঞ্চদশ রচনা।

শান্তিপুর নবদ্বীপ গঙ্গা পরিহরি।
বৃন্দাবন শুভযাত্রা বল হরি হরি॥
অনেক দিবস বাঞ্ছা করেছিল মন।
তীর্থ স্থলে গিয়া কিছু করি পর্য্যটন॥
গয়া কাশী কি রূপ কি রূপ বৃন্দাবন।
তীর্থবাসী হয়ে লোক রয় কি কারণ॥
বেদে বলে বৃন্দাবন গোলোক সমান।
তাহা ছাড়ি কেন লোক রহে অন্য স্থান॥
বারাণসী পুরী বটে দ্বিতীয় কৈলাস।
সন্ন্যাসী রামাত দণ্ডী তথা করে বাস॥
অন্নপূর্ণা দরশনে বাঞ্ছা নিরন্তর।
নয়ন ভরিয়া হেরি প্রভু দিগম্বর॥
গয়াতে শ্রীপদ-চিহ্ন অতি নিরমল।
দরশন করি তনু হইবে সফল॥
বৃন্দাবন বলি মন কেঁদেছে আমার।
কি করিব কোথা যাব কিসে পাব পার॥
এমন সৌভাগ্য মম কত দিনে হবে।
আমার এ পাপ দেহ ব্রজভূমে যাবে॥
যোগিজন যে চরণ না পান ধেয়ানে।
সেই প্রভু দয়াময় দেখিব নয়নে॥

আশীর্ব্বাদ কর সবে কর দিয়া মাথে।
রাসসুন্দরী-ব্রজে যেন পায় ব্রজনাথে॥

আমার জীবন বৃত্তান্ত যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হইল, কিন্তু আমার জীবন চরিতের মধ্যে কর্ত্তার সম্বন্ধীয় কোন কথাই লিখিত হয় নাই। তাহাতে আমার বোধ হয়, এ পুস্তকখানি অঙ্গহীন হইয়াছে। যাহা হউক, আমি যে তাঁহার গুণবর্ণনে সমর্থ হইব, আমি এমন যোগ্য নহি। বাস্তবিক সে সমুদয় কথা বলা অতি বৃহদ্ব্যাপার। তাহা বিস্তারিত করিয়া বলা আমার সাধ্য নহে, তবে কিঞ্চিৎ মাত্র বলিতে পারি যে, তিনি অতি উত্তম লোক ছিলেন। তেমন একটি লোক বড় দেখা যায় না। তাঁহার শরীরটি বেশ স্থূলাকার ছিল। বাস্তবিক তাঁহাকে দেখিলে যেন কর্ত্তা কর্ত্তা বোধ হইত। অপরিচিত লোকও যদি হটাৎ তাঁহাকে দেখিত, সেও চিনিতে পারিত যে ইনিই কর্ত্তা। তিনি বড় দয়ালু ছিলেন। প্রজাদিগের প্রতি তাঁহার কত দয়া ছিল, তাহার ত সংখ্যাই নাই। আর অপরাপর সকলের প্রতিও তাঁহার অতিশয় দয়া প্রকাশ পাইত। তিনি যেমন দয়ালু ছিলেন, তেমন দাতাও ছিলেন। এমন কি তিনি খাইতে বসিলে যদি কেহ আসিয়া বলিত আমি কিছু খাই নাই, তাহা হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে খাইতে না দেওয়া যাইত, সে পর্য্যন্ত তিনি খাইতেন না, বসিয়া থাকিতেন; তাঁহাকে খাইতে দিয়া পরে আপনি খাইতেন। তিনি রাজকার্য্যেও বিলক্ষণ তৎপর ছিলেন, আর তিনি মামলা মোকদ্দমা বড় ভাল বাসিতেন। তিনি বিলক্ষণ প্রতাপবিশিষ্ট পুরুষ ছিলেন, তদুপযুক্ত তাঁহার বিশ পঁচিশটা মোকদ্দমা লাগাই

থাকিত। কখন তিনি মোকদ্দমা ছাড়া থাকিতেন না। ভারী ভারী লোকের সঙ্গে তাঁহার কাজিয়া ছিল। কিন্তু কখন কাহার নিকটে পরাজিত হইতেন না, মোকদ্দমা জয় করিয়াই আসিতেন। তাঁহার এমন দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ ও এমন বিশাল কণ্ঠধ্বনি ছিল যে, যখন তিনি কোন ব্যক্তির উপরে বিক্রম প্রকাশ করিতেন, তখন গ্রামস্থ সকল লোক কম্পিত-কলেবর হইত। যত ভারী ভারী জমিদারের সঙ্গে তাঁহার মোকদ্দমা ছিল। দুই পরগণার জমিদার এক কুঠীয়াল সাহেবের সহিত তাঁহার সর্ব্বদাই ফৌজদারী মোকদ্দমা হইত। কিন্তু পরমেশ্বরের প্রাসাদে ঐ সকল মোকদ্দমাই জয় হইত; একটি মোকদ্দমাতেও তিনি সাহেবের সহিত পরাজিত হইতেন না। আর দক্ষিণ বাড়ীর ভারী জমিদার মিরালি আমুদের সঙ্গেও তাঁহার অনেক ফৌজদারী মোকদ্দমা ছিল। তালুক মুলুক লইয়া ঐ সকল কাজিয়া হইত। তেঁতুলিয়া নামে এক গ্রাম আছে, ঐ গ্রামের বার আনা মিরালি আমুদের সম্পত্তি, অন্য চারি আনা হিস্বা ইহাঁদের আছে। ইহা ভিন্ন আর আর জমিজাতি লইয়াও অনেক গোলযোগ ছিল।

সেই মিরালি আমুদের সঙ্গে ক্রমাগত তিন পুরুষ পর্য্যন্ত মোকদ্দমা চলিয়াছিল। ঐ কর্ত্তাটির উত্তর দেশে কতকটা এলাকা আছে। একবার তিনি সেই উত্তর দেশে যান। তখন সকল ছেলে আমার জন্মে নাই, কেবল বড় ছেলে বিপিনবিহারী ৬ বৎসরের হইয়াছে। বাটীতে কেবল সেই ছেলেটি আছে। ইতিমধ্যে এক দিবস সেই মিরালি আমুদ হুকুম দিয়া ইহাঁদিগের অনেক প্রজাকে ধরিয়া মারপিট

করিতে আরম্ভ করিল, এবং অনেক প্রকার যাতনা দিয়া প্রজাদিগের নিকট হইতে খাজানা আদায় করিতে লাগিল। তখন বাটীতে যে গোমাস্তা ছিল, সে পীড়িত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। অন্যান্য যে সকল লোক ছিল, তাহারা বলিতে লাগিল, আমাদের কি সাধ্য, আমরা কি করিতে পারি। বাটীতে কেবল আমি আছি, আমিও তত্তুল্য, মামলা মোকদ্দমা কিছুই বুঝিতে পারি না। বিশেষতঃ এ সকল কর্ম্মের আমি কর্ত্তাও নহি। তখন ঐ প্রজাদিগের পরিবারগণ আমার নিকট আসিয়া কাঁদিতে লাগিল, এবং তাহাদিগকে যে প্রকার প্রহার এবং যাতনা দিয়া খাজানা আদায় করিয়া লইতেছে, তাহা, সমুদয় বলিয়া বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল। উহাদিগের কান্না দেখিয়া এবং ঐ সকল যাতনা মনে করিয়া আমার অসহ্য যন্ত্রণা হইতে লাগিল। আমার যে ছেলেটি লইয়া বাটীতে আছি, সে ছেলেটিও পত্রলেখার উপযুক্ত হয় নাই। তখন আমি ঐ ছেলেটিকে উপলক্ষ করিয়া একখানি পত্র দিয়া একজন লোক মিরালি আমুদের নিকটে পাঠাইয়া দিলাম। ঐ পত্র পাইয়া মিরালি আমুদ পরম সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের প্রজাগণকে খালাস দিলেন, এবং মিরালি আমুদ নিজে উদ্‌যোগী হইয়া তাঁহাদিগের প্রধান দুই জন মুরুব্বিকে আমাদিগের বাটীতে পাঠাইয়া সেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলেন। কিন্তু কর্ত্তাটি বাটীতে নাই, তাঁহার বিনা অভিপ্রায়ে এত বড় একটা কাজ করিয়া আমার মনে অতিশয় ভয় হইল। আমি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, একেতো আমি মামলা মোকদ্দমার কিছুই জানি না, বিশেষ অনেক কাল

ঐ মোকদ্দমা চলিয়া আসিতেছে, কেহ নিষ্পত্তি করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ কর্ত্তার বিনা অভিপ্রায়ে আমার দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইল। তিনি বাটীতে আসিয়া না জানি কত রাগ করিবেন। ইহা ভাবিয়া আমার অতিশয় দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল। এমন কি ভয়ে আমার প্রাণ কাঁপিতে লাগিল। কিছু দিবস পরে তিনি বাটীতে আইলেন। এ বিষয়ে যে সকল মধ্যবর্ত্তী ছিল, তাহারা কিছু মাত্র চিন্তিত হয় নাই। কিন্তু কর্ত্তা শুনিয়া পাছে রাগ করেন, এই ভাবিয়া আমি মৃতপ্রায় হইলাম। পরে তিনি বাটীতে আসিয়া শুনিলেন, মির সাহেবের সঙ্গে যে মোকদ্দমা পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছিল, তাহা আমার দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়াছে, এবং তাহার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। বস্তুতঃ কর্ত্তা বিশেষ বড় লোক ছিলেন, তিনি অনেক সৎকার্য্য করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হন। কর্ত্তার জীবনচরিত এই যৎকিঞ্চিৎ লিখিত থাকিল।

ষোড়শ রচনা।

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।

তুই শমন কি করিবি জারি, তুই শমন কি করিবি,
আমি কালের কাল কয়েদ করেছি।
মন বেড়ি তার পায়ে দিয়ে, হৃদ্‌-গারদে বসায়েছি॥
শমন রে তুই যা রে ফিরি, হবে না তোর শমনজারী,
আমি সদর দেওয়ানী আদালতে ডিগরিজারী ক'রে নিছি॥
মিছা কেন করিস লেঠা, মানি না তোর তলপচিঠা,
আমি বাকীর কাগজ উস্থল দিয়ে দাখিল ক'রে ব'সে আছি॥

আহা ধর্ম্ম কি অপূর্ব্ব পদার্থ! পৃথিবীতে ধর্ম্মের তুল্য দুর্ল্লভ বস্তু আর কিছুই দেখা যায় না। দেখ, রাজা যুধিষ্ঠির এই ধর্ম্মের জন্য আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন, তথাপি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হন নাই। এই ধর্ম্মের নিমিত্ত কত কত মহাত্মা প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাতে কিছু মাত্র কাতর হন নাই। ধর্ম্ম বিপদের সম্বল, ধর্ম্মের পরে আর ধন নাই, ধর্ম্মবলে সমুদ্রতরঙ্গে পতিত হইলেও গোষ্পদ তুল্য বোধ হয়। আহা জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা! তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখা দূরে থাকুক, তাঁহার নির্ম্মিত কর্ম্মের কণিকা মাত্র মনের মধ্যে উদয় হইলে, শরীর প্রাণ এককালে আচ্ছন্ন ও অবশ হইয়া পড়ে। এমন কি, স্বপ্ন দেখিলেও পরমেশ্বরের কর্ম্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিলক্ষণ দীপ্তিমান দেখা যায়।

১২৮০ সালে ২০এ আশ্বিনের প্রভাতের সময় আমি একটি স্বপ্ন দেখিতেছি। আমি যেন, একটি নদীতীরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, ঐ নদীর তীরে এক খানি নৌকা রহিয়াছে, ঐ নৌকার উপরে এক জন মাঝী বসিয়া আছে। আমার সঙ্গে এক জন চাকরাণী আছে, সেও আমার নিকটে দাঁড়াইয়া আছে। আমি যেস্থানে দাঁড়াইয়া আছি, সে স্থান উত্তম বালুচর। ইতিমধ্যে উহারি কিঞ্চিৎ দূরে অল্প জায়গায় বৃষ্টি হইতেছে; সে বৃষ্টি সর্ব্বত্র হইতেছে না। ঐ বৃষ্টি অতি গভীর শব্দে নামিয়াছে।

আমি এক দৃষ্টে ঐ বৃষ্টির দিকে তাকাইয়া আছি। দেখি, সে বৃষ্টি যেন স্বর্ণবৃষ্টি হইতেছে। এই প্রকার দেখিতে দেখিতে বৃষ্টি যেন আমার নিকটে আসিতে লাগিল। তখন দেখিলাম, ঐ বৃষ্টিতে যেন স্বর্ণচাঁপা সকল পড়িতেছে। তখন আমি এই আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া মহা পুলকিত হইয়া আমার ঐ চাকরাণীটিকে বলিলাম, দেখ, পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! স্বর্গ হইতে স্বর্ণচাঁপা সকল পড়িতেছে, ঐ বুঝি পুষ্পবৃষ্টি। এই বলিয়া মহা আহ্লাদিত হইয়া বলিতেছি, এস! আমরা এই স্বর্ণচাপা কুড়াইয়া লই। তখন আমার ঐ স্বর্ণচাঁপা দেখিয়া মনে এত আহ্লাদ হইয়াছে, যে সে আনন্দ আমার হৃদয়ে আর ধরিতেছে না। আমার মনের এই প্রকার ভাব বুঝিতে পারিয়া, ঐ নৌকার মাঝী আমাকে বলিতে লাগিল। আপনি ঐ স্বর্ণচাঁপা দেখিয়া গ্রহণের জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছেন কেন? ঐ স্বর্ণবৃষ্টি আপনার জন্যই হইতেছে ও স্বর্ণচাঁপা আপনি পাইবেন, আপনার নিকটেই আসিতেছে। তখন আমার মন কি পর্য্যন্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, তাহা মুখে বলা যায় না।

এই প্রকার দেখিতে দেখিতে অমনি জাগিয়া উঠিলাম। জাগিয়া দেখি, রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। তখন আমার নিকটে যাহারা ছিল, তাহাদিগের নিকটে ঐ স্বপ্নের কথা বলিতেছি। ইতিমধ্যে আমার সপ্তম পুত্রবধূর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া, স্বপ্নে যে এত আহ্লাদ হইয়াছিল, তাহার লেশ মাত্রও থাকিল না, স্বপ্নের কথা সকল ভুলিয়া গিয়া, বিষম বিষে শরীর মন এককালে অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন এই বিপদে পরমেশ্বর কি করিবেন, এই চিন্তাতেই মগ্ন হইলাম। ক্ষণকাল পরে, ঐ প্রসবিনীর গর্ভ হইতে একটি পুত্র সন্তান জন্মিল, ঐ পৌত্রটির মুখ দেখিয়া, তখন আমার সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়িল, এবং আহ্লাদসাগরে ভাসিতে লাগিলাম। আমার পৌত্র জন্মিয়াছে, এইত পরমাহ্লাদের বিষয়। সংসারী লোকের পক্ষে ইহার অপেক্ষা আহ্লাদ আর কি আছে! বিশেষ, স্বপ্নের কথা মনে পড়িয়া, সেই স্বর্ণচাঁপা পরমেশ্বর আমাকে দিয়াছেন, এই দৃঢ় বিশ্বাসে আহ্লাদে আমি এককালে মগ্ন হইয়া বলিতে লাগিলাম, হে দীননাথ! হে পিতা পরমেশ্বর! নিদ্রিত জাগ্রত কর্ম্ম আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া, আমার জ্ঞান হইতেছে, যেন তোমাকেই দর্শন করিতেছি। হে পিতঃ! আমি তোমার অজ্ঞান সন্তান, তোমার গুণ-গরিমা আমি কি জানিতে পারি, তথাপি তোমাকে শত শত ধন্যবাদ দেই।

সমাপ্ত।

রামদিয়ার ১২৮০ সালের জ্বর বর্ণন।

রাগিণী ধানশী। তাল খেমটা।

হায় হায় হ'চ্চে এই রামদিয়াতে জ্বরের মালখানা।
সন ১২৮০ সালে কার্ত্তিক মাসে যায় জানা॥
জ্বরের এম্নি যে রীতি, যার বাড়ীর যেটি,
ক্রমে ক্রমে শয্যাগত হচ্চে সকলটি;
আবার ভিন্ন দেশের লোক আইলে অম্নি পড়ে বিছানা॥
সে জ্বরের ভঙ্গী বুঝা ভার, হ'ল কি এবার,
রোগীদিগের ভাব দেখিয়া লাগ্‌চে চমৎকার;
মলাম গেলাম শব্দ মুখে মা বাবা বৈ বলে না॥
তাহে পোহায় না রাতি, একি দুর্গতি,
ঘরে ঘরে হাত ধরিয়া দেখ্‌ছে পার্ব্বতী;
যার হ'চ্চে সেই কাঁদ্চে ব'সে, ঔষধ পথ্য মেলে না॥
আছে সরকারী বাড়ী, ঔষধের বড়ি,
বিনা মূলে দিচ্চে তারা লয় না তার কড়ি;
বাবুরা দয়া ক'রে দিচ্চে কত মিছরি আর সাগুদানা॥

আমার জীবন-চরিত।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম রচনা।

এস গো মা সরস্বতী পুরুক অভিলাষ।
নারায়ণ সঙ্গে আমার কণ্ঠে কর বাস॥
পতি সঙ্গে এস আমার হৃদ্ সিংহাসনে।
পাদ স্পর্শে ধন্য হই জীবনে মরণে॥
প্রসন্ন বদনে বৈস হয়ে কুতূহলী।
মনের সাধে যুগলপদে দিই পুষ্পাঞ্জলি॥

চৈতন্য-চরিত সিন্ধু, তরঙ্গের এক বিন্দু, তার কণা লিখে কৃষ্ণদাস।
রাসসুন্দরী মূঢ়মতি, তাহে শূন্য প্রেমভক্তি, যুগলচরণ অভিলাষ॥

সন ১২১৬ সালে চৈত্র মাসে আমার জন্ম হইয়াছে, এইক্ষণে ১৩০৪ সাল হইতেছে। আমার বয়ঃক্রম সেটের কোলে ৮৮ বৎসর হইল। এই ভারতবর্ষে আসিয়া এত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আমি জীবন যাপন করিলাম, এবং এখনও আমি সেই কাঠামেতেই আছি।

আমার বোধ হয় আমার সমান বয়সের লোক আমাদের বাসস্থানে অতি অল্প আছে। তাহাও আছে কি না সন্দেহ।

এই ভারতবর্ষে আসিয়া আমি ৮৮ বৎসর বাস করিলাম। জগদীশ্বর আমার এক জন্মেই বিলক্ষণ তিন জন্মের ভার বহন করিতে দিয়াছেন। এ কথাটী আমার বহু ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে।

সেই পরম পিতা বিশ্বব্যাপী বিশ্বপালক সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়-কর্ত্তার মনোহর সৃষ্টি দর্শন প্রতীক্ষাতে এই হতভাগ্য নরাধম রাসসুন্দরীর প্রতি সদয় হইয়া ৮৮ বৎসর কাল নিরাপদে জীবিত রাখিয়াছেন। হে নাথ দয়াময়! ধন্য, ধন্য, তোমার ঠাকুরালী ধন্য! তোমার নামামৃত আমার শ্রবণে প্রবিষ্ট হইয়া আমার মানব দেহ সফল হইল। আমি কৃতার্থ হইলাম।

এই ভারতবর্ষে আসিয়া আমি এত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জীবন যাপন করিলাম। এখনও আমি আছি, এতকাল এখানে বসিয়া আমি কি কাজ করিয়া সময় নষ্ট করিয়াছি।

ওরে আমার মন। তুমি আমাকে একেবারে ভবকূপে ডুবাইয়া রেখেছ। ওরে আমার মন, তোমার কি এই কাজ? মন, আমার সর্ব্বস্বধন তোমার হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে। মনরে, তোমার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে। মনরে, এই রত্নপূর্ণ ভারতবর্ষ, এই ভারতবর্ষে কত অমূল্য রত্নের খনি রহিয়াছে। কত শত দরিদ্র আসিয়া এই ধন যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চিত করিয়া মহাজন হইয়া বসিয়াছে। আমি নরাধম মায়ার দাস হইয়া বিষয় গর্ত্তে পড়িয়া আছি। হায়রে হায়, আমার মানব জন্ম বৃথা গেল। মনুষ্য জন্ম দুর্ল্লভ জন্ম, সে দুর্ল্লভ মানব দেহ পাইয়া রাধাকৃষ্ণের

চরণারবিন্দ না ভজিয়া মন, তুমি এই মাকাল ফলে ভুলে রহিয়াছ। আমার জীবনের নিশি শেষ হইয়াছে, আর সময় নাই।

দ্বিতীয় রচনা।

প্রভু জনার্দ্দন, শ্রীমধুসূদন, বিপদ ভঞ্জন হরি।
করুণাসিন্ধু, অনাথ বন্ধু, এ ভব সাগরে তরি॥
মাতৃগর্ভ হইতে, তোর দয়ার স্রোতে, ভাসিতেছি নিরবধি।
আছ পদে পদে, স্থলাদি জলেতে, তুমি হে করুণা নিধি॥
ও রাঙ্গাচরণ, ভজন বিহীন, আমি অভাজন অতি।
মিছা প্রবঞ্চনে, তরঙ্গ তুফানে, সতত বিস্মৃত মতি॥
অন্তরের যত, আছ অবগত, অগোচর কিছু নাই।
এই রাসসুন্দরী, নিজগুণে হরি, রেখো পদে দিয়া ঠাঁই॥

ওরে মন পাষণ্ড! ওরে মন নরাধম! তুমি বুঝি আমার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছ? সাবধান! সাবধান! সাবধান!! আমার পৈতৃক ধন, আমার মাতৃদত্ত ধন। আমি অতি বালিকাকালে আমার বুদ্ধির অঙ্কুর হইতে না হইতে আমার মা আমাকে ঐ দয়াময় নামটী বলিয়া দিয়াছেন। সেই দয়াময় নামটী মহামন্ত্র ও মহা ঔষধী বিশল্যকরণী হইয়া আমার অন্তরে অস্থিভেদী হইয়া রহিয়াছে। মনরে খবর্দ্দার, খবর্দ্দার! প্রলয় দৈত্যগণ চতুর্দ্দিকে সব ঘিরিয়া রহিয়াছে। ঐ দৈত্যগণ কোনক্রমে যেন আমার মন-ধনকে আক্রমণ করিতে না পারে। মন, তোমার চরণ ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিতেছি যেন বিস্মরণ হইও না।

গীত।

দেখো যেন ডুবেনা তরী, এই ভব-সাগরে তুফান ভারি।
মন হুঁসিয়ারে থেকো, তিলে তিলে জেগো,
গুরু বস্তু ধন যতনে রেখো, নিজে থেকো দ্বারে হইয়া দ্বারী।
এই ভব-সাগরে তুফান ভারি॥

এইক্ষণ আমার বয়স ৮৮ বৎসর হইয়াছে। ভারতবর্ষে আমি এতকাল পর্য্যন্ত আছি। আর কতকাল থাকিব তাহার নির্ণয় নাই। যাহা হউক, আমার যখন ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম সেই সময় আমার জীবন বৃত্তান্ত যৎকিঞ্চিৎ লেখা হইয়াছিল। এক্ষণে জগদীশ্বর আমার শেষকাণ্ডে কি কাণ্ড করিবেন তাহা তিনিই জানেন। এতদিন এখানে বসিয়া আমি কি কাজ করিয়া সময় নষ্ট করিয়াছি, একবার মনে ভাবিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

আহা আমাদের সেই পরম পিতা কৃপাসিন্ধু কৃপা করে আমাদের ভবের স্কুলে শিক্ষা করিতে পাঠাইয়াছেন। আমরা সকলে মিলিয়া এই ভবের স্কুলে শিক্ষা করিয়া সকল বিষয়ে উন্নত হইব বলিয়া আমাদের সেই দয়াময় পিতা কত প্রকার যত্ন করিতেছেন এবং কতই যে সাহায্য করিতেছেন তাহার কণিকামাত্রও জানিবার শক্তি আমাদের নাই। আমরা তাহার কিছুই জানি না, আমাদের মনের ভাব আমাদের পিতা যেন আমাদের খেলা করিতেই ভবের বাজারে পাঠাইয়াছেন। আমরা সকলে মিলিয়া মহাসুখে উদর পরিতোষ করিয়া মহানন্দে নানাবিধ আমোদ প্রমোদ করিয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছি। এই "ভবের খেলা, ধূলার খেলা" এই মিছা আমোদে ভুলিয়া আছি।

মন তুমি কি জানিয়াও জানিতেছ না ? মনরে, তুমি নিশ্চিত জানিও তুমি যাহার নিকট হইতে আসিয়াছ, যিনি তোমাকে এই ভবের বাজারে পাঠাইয়াছেন, পুনর্ব্বার তাঁহারই নিকটে ফিরিয়া যাইতে হইবে। সে কথা কি ভুলে গিয়াছ ?

১২১৬ সালে আমার জন্ম হইয়াছে। এইক্ষণ আমার বয়ঃক্রম ৮৮ বৎসর ভারতবর্ষে আমি অনেক দিবস আসিয়াছি। এত দিবস এখানে বসিয়া কি করিয়াছি ? আমার জীবন-রত্ন নিরর্থক ক্ষয় করিয়াছি! আহা, কি আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে! এক্ষণে নিরর্থক বালকের ন্যায় রোদনে কি ফল আছে ?

তৃতীয় রচনা।

রামের মন! বলি শোন্, পাগল হলি কি কারণ,
পাগলে কি জানে কোন ক্রম।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, চার যুগেতে এলি গেলি,
এখনও তোর ভাঙ্গল নারে ভ্রম॥
যিনি জগৎ কারণ, বিশ্বব্যাপী নিরঞ্জন, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যাহাতে ;
নাই তাঁর স্থানাস্থান,আছেন তিনি সর্ব্বস্থান,অবিদিত নাই ত্রিজগতে॥
শুন মন বলি ভাই, তাঁর পরে আর নাই, সেই বস্তু গোলোকের ধন।
সেই হরি দয়াময়, বসাইয়া হৃদয়, জ্ঞান নেত্রে কর দরশন॥

হে প্রভু অধম তারণ, হে করুণাময় বিপদভঞ্জন হরি, তোমার দয়ার তুলনা নাই। তোমার লীলা গুণ বেদ বিধির অগোচর। হে নাথ, তোমার মাহাত্ম্য তোমার নামের গুণ আমি নরাধম

কি বলিতে জানি? হে নাথ, তুমি যখন যাহা কর তাহাই আশ্চর্য্য বোধ হয়। আজি আমি তোমার একটী আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়াছি। হে দয়াময়, আমার মন পাষাণ। তোমার আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া সেই পাষাণ মন আহ্লাদে গলিয়া পড়িতেছে। হে প্রভু মদনগোপাল, তোমার আশ্চর্য্য দয়ার প্রভাব দেখিয়া আমার মন পুলকে পূর্ণ হইয়া নৃত্য করিতেছে। আজি আমার মনে আনন্দ আর ধরিতেছে না।

এই সকল কথা আমার মনের কথা, অন্য লোক কেহ জানে না। সেই জন্য এ কথাটী আমি বিশেষ করিয়া বলিতেছি। আমাদের সেকালে সেই একমত ব্যবহার ছিল। এখন সে সকল পরণ পরিচ্ছদ কিছুই নাই। সে যাহা হউক আমার নাকে একখানি বেশর ছিল, সে বেশরখানি অৰ্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি। সেই বেশরের সঙ্গে ঐ রকম বেশর আর তিনখানি লাগান ছিল।

এই বাটীর নিকটে পুষ্করিণী আছে। এক দিবস আমি পুষ্করিণীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছি। আমি আমার গলা জলে নামিয়া কাপড় কাচিতেছি, এমন সময় আমার কাপড়ের সঙ্গে বাধিয়া বেশরখানি গভীর জলে পড়িয়া গেল। যখন বেশর জলে পড়িয়া গেল সেই সময় ঐ বেশরখানি পাইবার জন্য কত লোক জলে নামাইয়া নানাপ্রকার করিয়া জলের মধ্যে তল্লাস করা হইয়াছিল। তখন কিছুতেই বেশরখানি পাওয়া গেল না। আর পাইবার কথাও নহে এবং ও বেশরখানি আর পাইবার আশাও মনে করি নাই।

যখন ঐ বেশর হারাইয়াছে তখন আমার বয়ঃক্রম ২২ বৎসর। তখন আমার দুইটী পুত্র জন্মিয়াছে। তাহার পর আর আটটী পুত্র, দুইটী কন্যা জন্মিয়াছে। পরে ক্রমে ক্রমে জল শুকাইয়া

পুষ্করিণীটী অকর্ম্মা হইয়া পড়িয়া থাকিল। সেই পুষ্করিণীর মধ্যে কত বৃক্ষাদি হইয়া জঙ্গলে পূর্ণ হইল।

তাহার অনেকদিন পরে আমার পঞ্চম পুত্র দ্বারকানাথ গোঁয়াড়ি কৃষ্ণনগরে কর্ম্ম করে, সে ঐ পুষ্করিণীটী নূতন করিয়া কাটাইল। পুষ্করিণী কাটাইয়া মাটি পুষ্করিণীর ধারেই রাখা হইয়াছিল। কিছু দিবস পরে ঐ মাটি দিয়া পুষ্করিণীর ধারে প্রাচীর গাঁথান হইয়াছে।

পরে অনেক দিবস পরে সেই প্রাচীরের অর্দ্ধেকটা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। আর অর্দ্ধেক প্রাচীর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; সেই ভাঙ্গা প্রাচীরটার উপরে আমার ঐ বেশরখানি যেন সমান হইয়া শুইয়া আছে।

ঐ বেশরখানির উপরে যে মাটি চুটি পড়িয়া ঢাকা ছিল, বৃষ্টির জলে জলে সব ধুইয়া গিয়াছে। বেশরখানি অল্প অল্প দেখা যাইতেছে। সেটী আমাদের খিড়কীর ঘাট. আমি সেখানে দাঁড়াইয়া আছি। সেই স্থান হইতে ঐ বেশরখানি অল্প অল্প দেখিতে পাইতেছি। সেই বেশরখানি দেখিয়া আমি বলিলাম "ওখানা কি দেখছি?" আমার নিকট একটী জেলেদের মেয়ে দাঁড়াইয়া ছিল সেই মেয়েটী দৌড়িয়া ঐ বেশরখানি আনিয়া আমার হাতে দিল।

তখন ঐ বেশরখানি আমি হাতে করিয়া দেখিলাম, আমার সেই বেশরখানি বটে। ঐ বেশর হাতে লইয়া দেখিয়া আমার শরীর মন এককালে যেন অবশ হইয়া পড়িল। তখন আমার মনে কি ভাব হইল তাহা আমি কিছুই বলিতে পারি না। তখন আমার দুই চক্ষের জল পড়িয়া ভেসে যাইতে লাগিল। আমি আমার চক্ষের জল মুছিয়া ঐ বেশরখানি দেখিতে লাগিলাম।

জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া আমার হৃৎকম্প হইতে লাগিল। যখন আমার বয়স ২২ বৎসর তখন ঐ বেশরখানি আমার নাক হইতে খসিয়া গভীর জলের ভিতর পড়িয়াছে, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যখন আমার বয়স ৮২ বৎসর তখন আমার সেই বেশরখানি আমি পাইলাম। এই ৬০ বৎসর পরে আমার সেই বেশরখানি যেমন পূর্ব্বে আমার নাকে ছিল এখনও সেইমত আছে, স্বর্ণ বর্ণ বিবর্ণ হয় নাই। কি আশ্চর্য্য কাণ্ড!

জগদীশ্বর কি না করিতে পারেন? এই বেশরখানি ৬০ বৎসর হইল জলে পড়িয়া হারাইয়া গিয়াছে, আর কখন যে বেশরখানি পাইব একথা কখনও মনেও উদয় হইত না। আর পাওয়ারও কথা নহে।

৬০ বৎসর এ বেশরখানি কোথায় ছিল। ৬০ বৎসর পরে আমার সেই বেশর কে আমার হাতে আনিয়া দিল? এই বেশর-খানি ৬০ বৎসর জল, কাদা, মাটির মধ্যে ছিল, সেই মাটি নানা প্রকার তাড়ন করা হইয়াছে। পুকুর হইতে মাটি কাটিয়া নিয়াছে, সেই মাটি জল দিয়া পা দিয়া কাদা করিয়াছে, পরে সেই মাটি লইয়া পুষ্করিণীর ধারে প্রাচীর গাথা হইয়াছে। তখনও বেশর ঐ প্রাচীরের মধ্যেই আছে। এত তাড়নেও বেশর পূর্ব্বে যে প্রকার ছিল সেই মত আছে। ঐ বেশরখানি যদি আমার নিকট এতদিন থাকিত তাহা হইলে ভেঙ্গে চুরে এতদিন কোথায় যাইত।

হে প্রভু দয়াময়, হে নাথ অধম তারণ, তুমি নির্ধনের ধন, দুর্ব্বলের বল, বিপদের তরণী। হে প্রভু কৃপাসিন্ধু তুমি নিজ গুণে সদয় হইয়া এই অধিনীর প্রতি দয়া করিয়া ঐ বেশরখানি আমাকে দিবে বলিয়া এই ৬০ বৎসর কত কষ্টে এবং যত্নে

রাখিয়াছিলে, এবং আমার হাতেই দিলে। আজ আমার মনের আনন্দ মনে আর স্থান পাইতেছে না।

হে প্রভু, এই হতভাগ্য নরাধম রাসসুন্দরীর প্রতি তোমার এত দয়া প্রকাশ করিয়াছ। আমি ঐ বেশরখানি হাতে পাইয়া আমার জ্ঞান হইল, আমি যেন স্বর্গের চন্দ্র হাতে পাইলাম। আমি সোণা হারাইয়াছিলাম, সেই সোণা আবার পাইলাম বলিয়া এত সন্তোষিত হইয়াছি একথাটী যেন কেহ মনেও না করেন, আমি সেই করুণাময়ের করুণা প্রভাব দেখিয়া এত আহ্লাদিত হইয়াছি। সেই বেশর পাইয়া মনে করিলাম এ বেশর আমি কোথায় রাখি, কোথা রাখিলে মন সন্তোষ হয়। এ বেশরখানি ভাঙ্গিব না, যেমন আছে তেমনি থাকিবেক কিন্তু মদনগোপালের অঙ্গে থাকিবেক, নাকে দিলে বড় হয় এই ভাবিয়া মদনগোপালের মাথায় চূড়ার সঙ্গে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মদনগোপালের মাথার চূড়ার সঙ্গে বেশর অতি উত্তম সাজিয়াছে।

প্রভু মদনগোপাল, তুমি তোমার অধিনী কন্যার বেশরখানি পুনর্ব্বার তাহার হাতে দিবার জন্য এত যত্নে রাখিয়াছিলে এবং ৬০ বৎসর পরে আমার হাতেই দিলে, ঐ বেশরখানি হাতে করিয়া আমার জ্ঞান হইল যেন আমি তোমাকেই পাইলাম।

চতুর্থ রচনা।

হে পদ্মপলাশ, ভক্ত হৃদে বাস, বিভু বিশ্ব নিকেতন।
বিকার বিহীন, কাম ক্রোধ হীন, নির্ব্বিশেষ সনাতন॥
তুমি সৃষ্টিধর, পূর্ণ পরাৎপর, অন্তরাত্মা অগোচর।
সর্ব্ব শক্তিমান, সর্ব্বত্র সমান, ব্যাপ্ত সর্ব্ব চরাচর॥
অনন্ত, অব্যয়, অসুখ, অভয়, একমাত্র নিরাময়।
উপমা রহিত, সর্ব্বজন হিত, ধ্রুত, সত্য, সর্ব্বাশ্রয়॥
সর্ব্বাঙ্গ নিশ্চল, বিশ্বাদ্ধি নিশ্চল, পরমব্রহ্ম সুপ্রকাশ।
অপার মহিমা, অনন্ত অসীমা সর্ব্ব সাক্ষী অভিলাষ॥
নক্ষত্র তপন, চন্দ্রমা পবন, ভ্রমে নিয়মে তোমার।
জলবিন্দু পর, শিল্প কার্য্যকর, রূপ দেও চমৎকার॥
পশু পক্ষী নানা, জন্তু অগণনা, তোমারি নিয়মে হয়।
স্থাবর জঙ্গম, যথা যে নিয়ম, সেই ভাবে সবে রয়॥
মাতার উদরে, দাও সবাকারে, জীবের জীবন দাতা।
রস রক্ত স্থানে, দুগ্ধ দাও স্তনে, পানহেতু বিশ্ব পিতা॥
জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ, সংসার প্রসঙ্গ, তোমারই নিয়মেতে।
তুমি পরাৎপর, পরম ঈশ্বর, কে পারে তোমায় জানিতে॥
তুমি যজ্ঞেশ্বর, যজ্ঞপূর্ণ কর, এই কর দয়াময়।
রাসসুন্দরীর মন, হইয়া চন্দন, তব পদে লয় হয়॥

এই ভারতবর্ষে আসিয়া আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত বাস করিলাম। হে প্রভু মদনগোপাল, তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম। আমার অপরাধ ক্ষমা করিবা। আমি তোমাকে ডাকিতে জানি না। হে নাথ, আমি তোমাকে চিনি না, তোমার মহিমা আমি

কি জানিব ? আমার জীবনে আদি অন্ত যে পর্য্যন্ত আমার স্মরণ আছে, আমি মনে মনে ভাবিয়া বেশ করিয়া দেখিলাম, আমার মন, আমার শরীরের রোমে রোমে তোমার দয়া প্রজ্জলিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। হে কৃপাসিন্ধু মদনগোপাল, তুমি নিজগুণে দয়া করে এই অধিনীর প্রতি সদয় হইয়া আমার জীবনে মরণে সম্পদে বিপদে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছ, এবং অহরহঃ আমার সঙ্গে আছ। ওহে নাথ দয়াময়, তোমার দয়ার তুলনা নাই, আমাদের এমন যে হৃদয়বন্ধু আছেন, আমি নরাধম চিনিলাম না। এমন বন্ধু থাকিতে তাঁকে একবার স্মরণও করি না, আমি এমনি হতভাগ্য নরাধম।

পঞ্চম রচনা।

হে প্রভু মদনগোপাল কাঙালের ঠাকুর।
নির্দ্ধনের ধন তুমি দয়ার সাগর॥
তুমি হে ব্রহ্মাণ্ডপতি পতিত পাবন।
পতিতের গতি তুমি ব্রহ্ম-সনাতন॥
ও পদ ভজন হীন আমি দুরাচার।
অধম তারণ নাম জানা যাবে এইবার॥
কখন কোথায় নাথ কোন্ ভাবে রহ।
কে তোমায় জানিতে পারে যদি না জানাহ॥
প্রেম নাহি, ভক্তি নাহি, শক্তি নাহি আর।
তোমাকে জানিতে নাথ কি সাধ্য আমার॥

তুমি প্রভু কর্ণধার জগতের গুরু।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর বাঞ্ছাকল্পতরু॥
যাগ যজ্ঞ তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না জানি।
অন্যের অনেক আছে আমার কেবল তুমি॥
যাহা কিছু মুখে বলি যা ভাবি অন্তরে।
সকলি জানিবা তোমায় পাইবার তরে॥
ভজন জানি না হে পদ্মপলাশ লোচন।
নিজগুণে রাসসুন্দরী দেও হে দর্শন॥

১২১৬ সালে আমার জন্ম হইয়াছে। এইক্ষণ ১৩০৪ সাল আমার বয়ঃক্রম ৮৮ বৎসর হইয়াছে। এত দীর্ঘকাল হইল আমি ভারতবর্ষে আসিয়াছি। ভারতবর্ষে অনেকদিন বাস করা হইল, এখন কি যাইতে হবে কি থাকিতে হবে তাহার নির্ণয় নাই। কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম, জগদীশ্বর কর্ত্তা, তিনি যাহা করেন সেই উত্তম। কিন্তু নাথ অধিনীর এই প্রার্থনা, আমার সেই সময়, আমার প্রাণান্তের সময় দয়া করে শ্রীচরণে স্থান দিতে হবে, দেখ যেন তোমায় না ভুলি।

হে নাথ করুণাসিন্ধু, হে অনাথ বন্ধু, তোমার লীলার পারাপার নাই। তুমি সাপ হয়ে কামড়াও ওঝা হয়ে ঝাড়। হাকিম হয়ে হুকুম দাও পেয়াদা হয়ে মার॥ তোমার মন তুমি জান।

আমি ক্ষুদ্র জীব তোমার মহিমা কি জানিতে পারি? হে নাথ তোমার লীলা গুণ বেদবিধির অগোচর।

ষষ্ঠ রচনা।

তুমি নারায়ণ, লক্ষ্মীকান্ত, মাধব মধুসূদন।
ভব পরাভব, অনন্ত অশক্ত, তব লীলা গুণ বর্ণন॥
তুমি গোবিন্দ, গৌরচন্দ্র, গোপাল গোবৰ্দ্ধন।
ভব পরাভব, অনন্ত অশক্ত, তব লীলা গুণ বর্ণন॥
তুমি রাধাবল্লভ, রাঘবকিশোর, রঘুবর রঘুনন্দন।
ভব পরাভব, অনন্ত অশক্ত, তব লীলা গুণ বর্ণন॥
তুমি যদুকুল ধন, যশোদা নন্দন কৃষ্ণ কংসনাশন।
ভব পরাভব, অনন্ত অশক্ত, তব লীলা গুণ বর্ণন॥
তুমি শমন দমন, শ্রীশচী নন্দন, তুমি হে জগৎ জীবন।
ভব পরাভব, অনন্ত অশক্ত, তব লীলা গুণ বর্ণন॥
তুমি পরম ঈশ্বর, পিতাম্বর, পদ্মপলাশ লোচন।
ভব পরাভব, অনন্ত অশক্ত, তব লীলা গুণ বর্ণন॥
তুমি বলিকে ছলিলে, তিন পদ দিয়া করিলে দান গ্রহণ।
ভব পরাভব, অনন্ত অশক্ত, তব লীলা গুণ বর্ণন॥
রাসসুন্দরী অতি অধম দুর্ম্মতি, জানে না সাধন ভজন।
ভব পরাভব, অনন্ত অশক্ত, তব লীলা গুণ বর্ণন॥
আমায় করোনা নিরাশ, ওহে শ্রীনিবাস, দিতে হবে রাঙ্গাচরণ॥

হে নাথ ভক্তবৎসল, তোমার নাম দয়াময়। এই দয়াময় নামটী ত্রিজগতে বিখ্যাত হইয়া আছে। এই রাসসুন্দরী হতভাগ্য নরাধমের জন্য হে নাথ, তোমার এ পরম পবিত্র দয়াময় নামে যেন কলঙ্ক না হয়। তোমার চরণে আমি শত শত অপরাধে অপরাধী, হে দয়াময়, তুমি নিজগুণে সে অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া

এ অধিনীর প্রতি সদয় হৃদয় দেখাইতেছ, পরে আমার কি করিবে তাহা তুমিই জান।

১২১৬ সালে আমার জন্ম হয়, এক্ষণে ১৩০৪ সালে আমার বয়ক্রম ৮৮ বৎসর। এতকাল ভারতবর্ষে বাস করিতেছি, কি কাজ করিয়া জীবনরত্ন ক্ষয় করিয়াছি? হায়রে হায়, মনে করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমার মানব জন্ম বৃথা গেল, পশু পক্ষী জীব জন্তু ইত্যাদি সকলেই উদর পূর্ণ করিয়া থাকে, অনাহারে কেহ থাকে না। ইতিমধ্যে কোন পাখীর যদি সাধুসঙ্গ মিলে তবে সেই পাখীর মুখে রাধাকৃষ্ণ নামটী উচ্চারণ হয়। আমি হতভাগ্য, আমার ভাগ্যে সাধুদর্শন হইল না।

সপ্তম রচনা।

দেখতে এসে ভবের মেলা, দেখি সব মেলা মেলা,
মনোহারী দোকান মেলা।
নানা রত্ন অলঙ্কারে, রাখিয়াছে থরে থরে,
সাজাইয়া রংমহলা।
আয়না চিরুণ মতির মালা, দোকান করেছে আলা,
তাই দেখে ভুল্লো নয়ন ভোলা।
সাধ ছিল বেঁধে ভেলা, পার হ'ব হেলে হেলা,
থাকিল তাহা মাথায় তোলা।
থাকতে পিতা কৃপাসিন্ধু, কিসে এলাম রসসিন্ধু,
ঐ দোকানে তোলা তোলা।
রাসসুন্দরীর ভাগ্য গুণে, মন ভুলেছ ঐ দোকানে,
ধন খুঁজতে গেল বেলা।

গীত।

মনরে বিপাকে পলি, সেই মাকাল ফলে ভুলে রলি।
দয়াময় পিতা কৃপাসিন্ধু, কৃপাসিন্ধু ছেড়ে রসসিন্ধু কিন্‌তে এলি॥
মনরে বিপাকে পলি॥

এই ভবের বাজারে আসিয়া আমি চক্ষু উন্মিলিত করিয়াই ঐ মনোহারীর দোকান দেখতে পেলাম। তখন কি আর অন্য কথা মনে করিবার সময় থাকিল? তখন যেদিকে তাকাই সেই দিকেই ঐ মনোহারীর দোকান, চতুর্দ্দিক সব ঝলমল করিতেছে। এই ভবের বাজারে যেদিকে তাকাইতে লাগিলাম সেই দিকেই মনোহারীর দোকান দেখ্‌তে পেলাম। ঐ মনোহারী দোকান দেখিয়া আমার আশ্চর্য্য বোধ হইল। তখন মনে ভাবিলাম এই ভূমণ্ডলে মনোহারী দোকান ভিন্ন উত্তম পদার্থ বুঝি কিছু নাই।

ঐ সকল আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া আমার মন এককালে মোহিত হইয়া পড়িল। আমিও ঐ মনোহারী দোকান একখানি পাতিয়া বেশ করিয়া সাজাইয়া ঘটা করিয়া বসিলাম।

এই রত্নপূর্ণ ভারতবর্ষ, এই ভারতবর্ষে কত শত অমূল্য রত্নের খনি রহিয়াছে, কত দরিদ্র ঐ রত্ন কিঞ্চিৎ সঞ্চিত করিয়া মহাজন হইয়া বসিয়াছে। সেই ভারতবর্ষে আসিয়া আমি ৮৮ বৎসর পর্য্যন্ত আছি, এত দিবস কি কাজ করিয়াছি? ঐ মনোহারী দোকানেই বসিয়া আছি।

ছি রে ছি! এই মায়া পিশাচীর দাসত্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া বিষের গর্ত্তে পড়িয়া আমার জীবনরত্ন ক্ষয় করিয়াছি। হায়রে হায়, আমার মানব জন্ম বৃথা গেল। দুর্ল্লভ মানব জন্ম পাইয়া

রাধাকৃষ্ণের যুগল চরণ কেন ভজন করিলাম না? ধিক্‌, ধিক্‌, আমার জীবনে ধিক্‌। "এ দেহে তায় পেলামনারে আর কি পাব দেহ গেলে, ধিক্‌, ধিক্‌, জনম মানবকুলে। হরিপদ না ভজিয়ে দিন গিয়াছে হেলে হেলে, ধিক্‌, ধিক্‌, জনম মানবকুলে।" আমার বৃথা কাজে দিন গেল, আমার মানব জন্ম বৃথা হইল। ভারি আক্ষেপের বিষয়, মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

নবম রচনা।

ওহে নাথ, জগৎ তাত, সুদর্শনধারী,
দাও দরশন হৃদয়-রতন হৃদি বেদনা নিবারি।
সদয় হৃদয়ে এস হৃদি-সিংহাসনে,
মন-পুষ্প চন্দনেতে পূজিব চরণে।
তুমি হে মনের মন দেহের সারথী,
যেদিকে চালাও রথ তথা যায় রথী।
অনিত্য বাসনা দিয়া করোনা বঞ্চন,
রাসসুন্দরীর যেন তব পদে রহে মন।

আমি ভারতবর্ষে অনেককাল বাস করিলাম। এখনও আমি আছি। আমার শরীরের অবস্থা ও মনের ভাব কোন্‌ সময় কি প্রকার ছিল এবং এখনি বা কিরূপ আছে তাহা আর বিশেষ করিয়া কি বলিব? যিনি আমার অন্তরে সততই বিরাজমান রহিয়াছেন, তিনিই আমার মনের অবস্থা বিলক্ষণরূপে জানিতে পারিতেছেন।

পূর্ব্বে আমার শরীর যেরূপ ছিল সে বহুকালের কথা। এক্ষণে তাহা বলাও বাহুল্য, এবং সে কথা শুনিলে এখনকার মেয়ে ছেলেরা

বলিবে ইনি গৌরব করিয়া নিজের প্রশংসা জানাইতেছেন, বাস্তবিক তাহা নহে। সে কথা যেন কেহ মনেও না করেন। আমাদের সেকালে যে প্রকার কাজের নিয়ম ছিল এবং আমি যে মতে কাজ করিতাম, বিশেষ আমার শরীরের অবস্থা পূর্ব্বে যেরূপ ছিল তাহা কিঞ্চিৎ বলি।

আমাদের সেকালেতে মেয়েছেলেদের লেখাপড়া শিক্ষা করা নিয়ম ছিল না। সেকালের লোকেরা বলিত "এ আবার কি? মেয়েছেলে লেখাপড়া করিতেছে? মেয়েছেলে লেখাপড়া করা বড় দোষ। মেয়েছেলে লেখা শিখলে সর্ব্বনাশ হয়, মেয়েছেলের কাগজ কলম হাতে করিতে নাই।" এই প্রকার নিয়ম সর্ব্বত্রই চলিত ছিল।

এখন জগদীশ্বর সব বিষয়েই নূতন নিয়ম সৃষ্টি করিয়াছেন, এখনকার নিয়ম দেখিয়া আমি বড় সন্তোষ হইয়াছি। এখনকার মেয়েদের কোন বিষয়ে কষ্ট নাই, এখনকার জন্য অতি উত্তম নিয়ম সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন যাহার একটী কন্যা সন্তান জন্মিয়াছে, তাহার মাতা পিতা সেই মেয়েটীকে পরম যত্নে শিক্ষা দিয়া থাকে। আমি দেখিয়া বড় সন্তোষ হই, বেশ হইয়াছে। আমাদের সেকালে মেয়েছেলের লেখাপড়ার নিয়ম ছিল না, আমি লেখাপড়া কিছু জানি না। লেখাপড়ার কি মাহাত্ম্য তাহাও জানি না, আমাদের লেখাপড়ার কাজতো কিছু ছিল না, সংসারে কাজ যাহা তাহাই করিতাম।

আমি এতকাল যে সংসারে ছিলাম এখনও সেই সংসারে আছি। সে সংসারটী বড় মন্দ নহে, ঐ বাটীতে মদনগোপাল বিগ্রহ স্থাপিত রহিয়াছেন, তাঁহার অন্ন ব্যঞ্জন ভোগ হইয়া থাকে, অতিথি অভ্যাগতের গমনাগমনও এক প্রকার মন্দ নহে।

আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী ছিলেন, তাঁহার নাম্নিকের পীড়া ছিল, তিনি চক্ষে দেখিতে পাইতেন না। এই দুই বিগ্রহ সেবা করা আমার সর্ব্বোপরি শিরোধার্য্য।

আমার দেবর ভাসুর কেহ ছিল না। আমি একমাত্র ছিলাম, আমার তিনটী ননদ ছিল। সে সময় তাঁহারা তাঁহাদের নিজ বাটীতে থাকিতেন। ঐ বাটীতে চাকর চাকরাণী বিশ পঁচিশ জন আছে, তাহাদিগকে দুই বেলা ভাত পাক করিয়া দিতে হয়। আমাদের সেকালে ব্রাহ্মণে পাক করার প্রথা ছিল না। যত লোক খাইতে দিতে হইবে, সব পাক বাটীর মধ্যে করিতে হইবে। এই প্রকার সকল কাজের নিয়ম ছিল, আমি ঐ নিয়ম মতই সব কাজ করিতাম। এদিকে আমার দশটী পুত্র দুইটী কন্যা, এই বারটী সন্তান জন্মিয়াছে। এই বারটী সন্তান প্রতিপালনের ভার আমার প্রতিই সম্পূর্ণ রহিয়াছে।

সেই বাটীর মধ্যে চাকরাণী আছে নয়জন। তাহারা সকল লোকই বাহিরের লোক। ঘরে কাজ করা লোক নাই, কাজ করা একমাত্র আমি আছি। ঐ বাটীর যে কর্ত্তাটী ছিলেন তিনি স্নান পূজা সাঙ্গ হইলেই অন্য কিছু খাওয়া ভাল বাসিতেন না। ভাত পাইলেই সন্তোষ হইয়া খাইতেন। তজ্জন্য সকালে পাকের দরকার হয়।

ঐ সকলগুলা কাজ আমি একা করিয়াছি। প্রাতঃকালে পাক করিয়া ছেলেদের খাওয়ান, পরে স্নান করে মদনগোপালের ভোগে যাহা যাহা দরকার, সে সমুদায় সংগ্রহ করিয়া দিয়া পরে শাশুড়ী ঠাকুরাণীর যাহা যাহা লাগিবে সে সমুদায় তাহার সম্মুখে রাখিয়া পরে পাকের ঘরে যাইতাম। আগে কর্ত্তার পাক রান্না হইত,

পরে অন্যান্য পাক হইত। ঐ সংসারের যত কাজ ঐ সকলগুলা কাজ আমি একা করিতাম। আমার মনে ভাব যেন কেহ কোন মতে অসন্তোষ না হয়।

হে প্রভু দয়াময়, তুমি এই অধিনীর প্রতি সদয় হইয়া এতই শক্তি দিয়াছিলে। আমি দশ জনার কাজ একাই করিতাম, ইহাতে আমার পরিশ্রম বোধ হইত না। হে প্রভু কৃপাসিন্ধু, হে দীনের বন্ধু হরি, তুমি যেন আমার শরীর পাষাণ দিয়া বেঁধে দিয়াছিলে। তোমার দয়ায় আমার শরীরের রোগ বালাই কিছু ছিল না। এক্ষণে সেই শরীরের অবস্থা যে প্রকার হইয়াছে কিঞ্চিৎ বলি।

দশম রচনা।

চলিতে শকতি হীন জীর্ণ কলেবর।
দাঁড়াইলে চতুর্দ্দিকে দেখি অন্ধকার॥
সেই শরীরে অকস্মাৎ বিধি বিড়ম্বনা।
হস্ত পদ পূর্ব্বের মত চলিতে চাহে না॥
ক্রমে ক্রমে সময় মতে ওই দশা ঘটিল।
দশেন্দ্রিয় সঙ্গে ছিল সব ছেড়ে চলিল॥
লোভ বেটা ছাড়ে না সঙ্গ ঘটিয়াছে দায়।
উদর ভায়া ব্যাকুল হয়ে সভার পানে চায়॥
কন্যারত্ন সযতনে নিযুক্ত সেবায়।
যখন যা প্রয়োজন সম্মুখে যোগায়।

হে প্রভু মদনগোপাল, হে করুণাময় ভবসিন্ধুর তরি, তুমি অধম তারণ, পতিতপাবন, ভক্তবৎসল হরি। তোমার চরণে

কোটী কোটি প্রণাম। আমি নরাধম, হে নাথ, তোমাকে চিনি না। তোমার চরণে কত শত অপরাধী। আমার অপরাধের সংখ্যা নাই, হে প্রভু দয়াময়, তোমার নিজগুণে অধিনীর অপরাধ ক্ষমা করিতে হবে। যেন তোমার চরণ ছাড়া করোনা, আমার মন ছাড়া হয়োনা। এই নরাধম রাসসুন্দরীর এই প্রার্থনা, যেন তোমায় না ভুলি।

সংসার যাত্রা।

হে প্রভু বিশ্বব্যাপী বিশ্বপালক, সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা! তুমি এই সংসার যাত্রায় অধিপতি অধিকারী মহাশয়! হে অধিকারী মহাশয়! তুমি ইচ্ছাময়, তোমার যখন যাহা ইচ্ছা তখন তাহাই হইয়া থাকে। তোমার সংসার যাত্রার দলে আনিয়া আমাকে যাত্রার আসরে এতদিন বসাইয়া রাখিয়াছ। আমি ৮৮ বৎসর যাত্রার আসরে একাসনে বসিয়া আছি।

অধিকারী মহাশয়! তোমার সংসারযাত্রা, অতি আশ্চর্য্য যাত্রা। তুমি কত আশ্চর্য্য সাজ সাজিয়া যাত্রার আসরে আনিয়া আমাকে দেখাইয়াছ। প্রথমে তুমি আমার মাতা, পিতা, ভাই, ভগ্নী, আত্মীয়, স্বজন সমুদায় সাজিয়া সাজিয়া তোমার সংসার যাত্রার আসরে আনিয়া আমাকে সে সমুদায় দেখাইয়া তুমি আবার লইয়া গিয়াছে। তুমি যে কোন্ সময় কি করিবা তাহা তুমি জান, কোন্ যাত্রার পালা কোন্ সময় সমাধা করিবে তাহা তোমার ঠিক আছে। তাহা অন্যের জানার শক্তি নাই। হে অধিকারী মহাশয়! তুমি যখন আমার পিতা, মাতা, ভাই ভগ্নী ও

বন্ধুবান্ধব সাজাইয়া যাত্রার আসরে আনিয়া আমাকে দেখাইয়া সমুদায় লইয়া গেলে, তখন আমার মনে অতিশয় আঘাত লেগেছিল বটে, কিন্তু সে সময় তুমি ঐ সকল যাতনা নিবারণ করে রেখেছিলে।

তাহার কিছু দিবস পরে তুমি আমাকে মা সাজাইয়া আমাদের দলে আমাকে প্রধান করিয়া বসাইয়া রাখিয়াছ। অধিকারী মহাশয়! তুমি বলিলে অমনি আমি মা সাজটী সাজিয়া আসরে বসিলাম। তোমার যাত্রার আসরে থাকিয়া কত আশ্চর্য্য সাজ সাজিয়া আসিতেছে আমি দেখিতেছি।

হে অধিকারী মহাশয়! তোমার সংসার যাত্রায় থাকিয়া যে কত আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিতেছি তাহার সংখ্যা নাই। তুমি আমা হইতেই আমাকে কত প্রকার সাজ সাজাইয়া আনিয়া দেখাইতেছ। আমার পুত্র, কন্যা, পৌত্র, দৌহিত্র, পৌত্রী, দৌহিত্রী এই সমুদায় সাজাইয়া তোমার যাত্রার আসরে আনিয়া আমাকে দেখাইয়া দেখাইয়া প্রায় সকলই তুমি নিয়া গিয়াছ।

সংসার যাত্রা।

অধিকারী মহাশয়, যখন তুমি আমার ছেলে সাজাইয়া সংসার যাত্রার আসরে আমার নিকট আসিয়া বলিয়া দেও "এই ছেলে তোমার, তুমি ছেলে কোলে লও, ইহাকে লালন পালন কর, এ ছেলে তোমাকেই দিলাম," বলিয়া আমারে কোলে ছেলে তুলিয়া দেও। তখন আমাকে মা সাজটী সাজাইয়া আসরে বসাইয়াছ। আবার তুমি আমার ছেলে সাজাইয়া আমার কোলে তুলিয়া দিলে। তখন আমি ঐ ছেলেটীকে কোলে লইয়া বসিলাম, সে সময় যে কি

আহ্লাদ আমার মনে উদয় হইল তাহা বলিতে পারি না। সে আনন্দ বর্ণনাতীত।

অধিকারী মহাশয়! ছেলে যে কত কষ্টে পাওয়া যায় তাহা তুমি জান। সেই কষ্ট ঐ ছেলেটীকে কোলে লইয়া ঐ ছেলেটীর মুখখানি দেখিলেই জল হইয়া যায়। ছেলেটীকে যখন কোলে লইয়া বসি তখন শরীর মন এককালে যেন আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া যায়। সে আনন্দ মনে আর স্থান পায় না, তখন জ্ঞান হয় আমি একজন কি হইলাম। অন্য বিষয় দূরে থাকুক, অধিকারী মহাশয়, তোমাকেও ভুলিয়া যাই।

হে অধিকারী মহাশয়, যখন ঐ ছেলেটীকে লইয়া বসি তখন আমার মন হয় যেন কি একজন হইলাম, যেন আকাশের চন্দ্র হাতে পাইলাম। তখন কি প্রকার মনে হয়. আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার সংসার, সকলি আমার। এই প্রকার শরীর মন আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া নৃত্য করিতে থাকে। আপনার দেহ স্মৃতি থাকে না। ঐ ছেলেটী পরম যত্নে বুকের মধ্যে রাখি, বোধ হয় প্রাণ হইতেও ছেলে অধিক।

অধিকারী মহাশয় তোমার গুণ বলিব কত?—কিছুক্ষণ পরেই তুমি সেই ছেলেটীকে আমার বুকের মধ্যে আমার কোলের মধ্যে হইতে কাড়িয়া লইয়া যাও। অধিকারী মহাশয়, তুমি কোথা হইতে ছেলে আনিয়া দাও তাহাও আমি কিছু জানি না, কোথায় আবার লইয়া যাও তাহাও কিছু জানি না। যখন আমার কোল হইতে ছেলেটী তুমি লইয়া যাও, সে সময় ইচ্ছা হয়, ঐ ছেলের সঙ্গে সঙ্গে যথাসর্ব্বস্ব যাউক। এবং আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়। অধিকারী মহাশয় তখন তুমি সেই

ছেলেটীকে লইয়া গেলে যে কষ্ট হয়, সে কষ্ট কি বিজাতীয় কষ্ট। সে বিষম কষ্টের সহিত কিছুরই তুলনা হয় না। সে কষ্ট যে জানে সেই জানে, আর অধিকারী মহাশয় তুমি জান।

অধিকারী মহাশয়, তুমি কোন্ সময়ে কোন্ পালা সমাধা করিবা, তাহা তুমি জান। তুমি আমাকে দশটী পুত্র সন্তান দুই কন্যা সন্তান এই বারটী সন্তান দিয়েছিলে, তাহার মধ্যে ছয়টী পুত্র একটী কন্যা এই সাতটী সন্তান তুমি আমাকে দেখাইয়া লইয়া গিয়াছ। এক্ষণে অবশিষ্ট চারিটী পুত্র একটী কন্যা এই পাঁচটী সন্তান আমার সম্মুখে রাখিয়া আমাকে দেখাইতেছ।

অধিকারী মহাশয়, তোমার একটী নাম দয়াময়। ঐ দয়াময় নামটী ত্রিজগতে বিখ্যাত আছে। তুমি নিদয় হইলেও বলিব দয়াময়। হে অধিকারী মহাশয়, তুমি আবার আমার পৌত্র, দৌহিত্র সাজাইয়া আমাকেই দেখাইতেছ। বিপিনবিহারীর দুই ছেলে, কন্যা দুইটী। দ্বারকানাথের চারিটী ছেলে, কন্যা একটী। কিশোরীলালের চারিটী ছেলে, দুইটী কন্যা। প্রতাপচন্দ্রের চারিটী ছেলে, তিন কন্যা। আমার দুই কন্যা, এক কন্যার এক ছেলে, ছোট কন্যাটীর একটী ছেলে একটী কন্যা। পৌত্র ১৪, দৌহিত্র ২, পৌত্রী ৮, দৌহিত্রী, ১, সর্ব্বসমেত ২৫ জন।

সংসার যাত্রা।

একাদশ রচনা।

ওহে প্রভু বিশ্বব্যাপী, বিশ্বময় বিশ্বরূপী,
কত রূপে কত অবতার।
মহাদেবে করে মোহ, মোহিনী রূপেতে মোহ,
তব মায়া কে হইবে পার ?
তুমি হে মনের মন, জানিছ সবার মন,
অগোচর নাহি চরাচর।
শিবভক্ত শিরোমণি, নিজ দাস মনে জানি,
আলিঙ্গিয়া হৈলে হরিহর॥
তুমি প্রভু গুণবন্ত, কে পায় তোমার অন্ত,
আদি অন্ত অনন্ত অব্যয়।
তুমি হে ত্রৈলোক্যপতি, অর্জ্জুন রথে সারথী,
ভক্ত স্থানে আছ পরাজয়॥
অন্যে কে জানিতে পারে, ভক্ত জানে ভক্তি জোরে,
আছ ভক্ত হৃদি-সিংহাসনে।
রাসসুন্দরী পদাশ্রিত, করুণা কর কিঞ্চিৎ,
দাস্যপদে রেখ হে চরণে॥

সংসার যাত্রা।

হে প্রভু করুণাময়, ওহে ভক্তবৎসল, অধম তারণ, তোমার লীলা বেদবিধির অগোচর। 'আমি কি বর্ণিব গুণ, পঞ্চমুখে পঞ্চানন, অনন্ত না পায় অন্ত যার।'

অধিকারী মহাশয় আমা হইতে আমাকে কত প্রকারই সাজ দেখাইয়া লইলে। কতকগুলি পুত্র, কন্যা, পৌত্র. দৌহিত্র, আমাকে দেখাইয়া তুমি লইয়া গিয়াছ। এক্ষণে বিপিনবিহারীর দুই কন্যা মাত্র। দ্বারিকানাথের তিন পুত্র, এক কন্যা। কিশোরী-লালের দুই পুত্র, তিন কন্যা। প্রতাপচন্দ্রের তিন কন্যা, তিন পুত্র। আমার এখন একটী কন্যা, শ্যামসুন্দরী নাম। সে কন্যাটীর এক পুত্র, এক কন্যা। বারটী সন্তান তুমি সাজাইয়া তোমার যাত্রার আসরে আনিয়া আমাকে দিয়াছিলে, ছয়টী পুত্র এক কন্যা আমাকে দেখাইয়া লইয়া গিয়াছ, এক্ষণে চারিটী পুত্র এক কন্যা তোমার যাত্রার আসরে রাখিয়া আমাকে দেখাইতেছ। আর আটটী পৌত্র, একটী দৌহিত্র, আর নয়টী পৌত্রী একটী দৌহিত্রী এখন পর্য্যন্তও দেখাইতেছ। অধিকারী মহাশয় তুমি কোন্ সময়ে কোন্ পালা সমাধা করিবে তাহা তুমি জান।

হে অধিকারী মহাশয়, আমার শেষকাণ্ডে কি কাণ্ড করিবা তাহা তুমি জান, তুমি যাহা কর সেই ভাল। কিন্তু আমার শেষের সময় দয়া করে শ্রীচরণে স্থান দিতে হবে।

অধিকারী মহাশয়, তোমার সংসার যাত্রাটী বড় শক্ত যাত্রা। এই সংসার যাত্রায় দেব, দৈত্য, মুনি, ঋষি আদি সকলেই আসিয়া থাকেন। কেহই সংসার যাত্রায় না আসিয়া থাকিতে পারেন না।

অন্যের কথা দূরে থাকুক, তোমার নিজের যাত্রায় তুমিই কতবার কত সাজ সাজিয়া আসিয়া থাক। হে অধিকারী মহাশয়, তুমি ত্রেতাযুগে তোমার যাত্রার আসরে কৌশল্যারাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তুমি এক অঙ্গে চারি অংশ হইয়া দশরথ রাজার পুত্র হইয়াছিলে। তোমাদের নাম রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন।

হে অধিকারী মহাশয়, তুমি যে প্রয়োজনে, সংসার যাত্রায় আসিয়া কৌশল্যারাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, সেই প্রয়োজন সাধন করিয়া, রাক্ষস বংশ ধ্বংস করিয়া ক্ষত্রিয় বল প্রকাশ করিয়া কিছুদিন অযোধ্যায় রাজা হইয়াছিলে। তোমার মনে যাহা আছে তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন হয়। সেই রামচন্দ্র যাত্রার পালাটী সমাধা করিয়া পরে তুমি তোমার সেই রাজরাজেশ্বর রামচন্দ্র সাজটী পরিত্যাগ করিয়া হাত পা ধুইয়া তুমি আবার অধিকারী মহাশয় হইয়া তোমার সংসার যাত্রার আসরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছ।

হে অধিকারী মহাশয়, তোমার সে রামযাত্রার পালার নাম হইয়াছে রাম অবতার। সপ্তকাণ্ড রামায়ণ লিখিয়া বাল্মীকি মুনি ঐ রাম নামটী দিয়া জগৎ উদ্ধার করিয়াছেন। সেই রাম নামে কত গুণ! হেলায় যদি কেহ মুখে একবার ঐ রাম নামটী বলে, মৃত্যুকালে রাম বলিয়া ডাকে তাহার শমন ভয় থাকে না। একবার রাম নাম বলিলে কোটি জন্মের পাপ বিনাশ হইয়া যায়।

রাম নাম গুণের আর নাহি পারাপার।
যে নামে আনন্দে হর হৈল দিগম্বর॥
চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা যাকে সদা করে ধ্যান।
যে নাম নারদ মুনি বীণায় করে গান॥

সংসার যাত্রা।

—o—

দ্বাদশ রচনা।

রক্ষ হে পুণ্ডরিকাক্ষ রাক্ষসের রিপু।
নরসিংহরূপে বধ হিরণ্যকশিপু॥
নম প্রভু রামচন্দ্র রাজীব লোচন।
বামেতে জানকী দেবী দক্ষিণে লক্ষ্মণ॥
দয়ার সাগর দীন দয়াময় নাম।
রঘুকুলোদ্ভব নব দূর্ব্বাদল শ্যাম॥
না জানি ভকতি স্তুতি আমি নারী ছার।
তব গুণ বর্ণিবার কি শক্তি আমার॥
তুমি হে দেবের দেব, দেব নারায়ণ।
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি পঞ্চানন॥
তুমি ইন্দ্র, তুমি চন্দ্র, তুমি দিবাকর।
বাঞ্ছার বরণ তুমি, তুমি ধনেশ্বর॥
তপস্বীর তপ তুমি, মুনিগণের সিদ্ধি।
প্রলয় পালন তুমি, তুমি জলনিধি॥
তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি তোমাতে প্রলয়।
সত্ব রজঃতম গুণে তুমি বিশ্বময়॥
তোমার সৃজন প্রভু এ তিন ভুবন।
তোমা পরে রক্ষা হেতু আছে কোনজন?

থাকিতে তুমি হে নাথ ডাকিব কাহারে ?
কাহারি বা সাধ্য আছে রক্ষা করিবারে ?
মহিমা গভীর বীরমিহির তৎসজ্জ ।
রাসসুন্দরীকে দেও হে ঐ পদপঙ্কজ ॥

অধিকারী মহাশয়, তুমি বহুরূপী। তুমি কখন কি সাজিয়া যাত্রার আসরে আসিয়া দাঁড়াইবা, তাহা তুমি জান। তুমি দ্বাপর-যুগে কৃষ্ণচন্দ্র রূপটী ধারণ করিয়া তোমার সংসার যাত্রার আসরে আসিয়া মথুরায় দৈবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তুমি কংশ কারাগারে দৈবকী গর্ভে জন্মমাত্রেই শঙ্খচক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ রূপ হইয়া দৈবকী বসুদেবকে দর্শন দিয়া তৎক্ষণাৎ গোকুলে আসিয়া যশোদানন্দন হইলে। হে অধিকারী মহাশয়, তোমার কখন কি খেলা খেলাইতে ইচ্ছা তাহা অন্যে কে জানিবে ? তোমার মনের কথা তুমিই জান। তুমি কিছু দিবস নন্দনন্দন হইয়া গোকুলে বাস করিয়াছিলে, পরে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া অধিষ্ঠান হইলে। সেই মধুর বৃন্দাবনে গোপ-গোপীগণের সঙ্গে তোমার মিলন হইল। তখন তুমি সেই মধুর বৃন্দাবনে ব্রজশিশুগণ সঙ্গে বনে বনে, যমুনার তীরে ধেনু চরাইয়া বেড়াইতে। তোমার লীলা গুণ বর্ণনাতীত।

তুমি রাজাধিরাজ মহারাজ পূর্ণব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি ভগবান-চন্দ্র। তুমি বৃন্দাবনে ব্রজশিশু সঙ্গে বনে বনে রাখাল বেশে ধেনু রাখিয়াছ। ব্রজশিশুগণ সঙ্গে আর কত খেলা করিয়াছ। হে অধিকারী মহাশয়, তোমার সেই শ্রীবৃন্দাবনে সেই মধুর ব্রজলীলা দর্শন প্রার্থনায় চতুর্মুখ পঞ্চমুখ আদি দেব ঋষিগণ কত যুগ যুগান্তর অনাহারে তপস্যায় প্রাণধারণ করিয়া আছেন।

আমি ক্ষুদ্রজীব, তাহে ছার নারীকুলে জন্ম। তোমার ব্রজলীলার মাহাত্ম্য আমি কি জানিতে পারি? বনের পাখী যদি সাধুসঙ্গ ভাগ্যক্রমে পায় সাধুসঙ্গ গুণে পাখী রাধাকৃষ্ণ নামটী উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করে। সাধুসঙ্গের গুণে অপবিত্র দেহ পবিত্র হয়। আমি এমনি হতভাগ্য নরাধম, পশুপক্ষী হইতেও অপদার্থ। আমি সাধুদর্শন পাইলাম না। হে অধিকারী মহাশয়, তোমার চরণে কোটী প্রণাম, তুমি নিজগুণে অপরাধ ক্ষমা করিও।

মধুর শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজলীলা দেখিবেন বলিয়া মহাদেব যোগী-বেশ ধারণ করিয়া উন্মত্ত হইয়াছেন। অধিকারী মহাশয়, তুমি শ্রীনন্দের নন্দন হইয়া যশোদার কোলে বসিয়া যশোদায় মা বলিয়া যশোদার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছ। মা যশোদা ধড়া চূড়া পরাইয়া রাখাল বেশে সাজাইয়া দিয়াছেন, তুমি ব্রজ গোপীদের সঙ্গে, ব্রজশিশুগণের সঙ্গে বনে বনে বনবিহার করিয়াছ। হে অধিকারী মহাশয়, তোমার সেই মধুর ব্রজলীলা, প্রেমরত্নপূর্ণ সেই বৃন্দাবনেই এই ব্রজলীলা শেষ হইলে, তোমার মনের যে বাঞ্ছা সে সমুদায় পূর্ণ করিয়া তুমি কংস যজ্ঞ উপলক্ষ করিয়া অক্রুর খুড়ার সঙ্গে মথুরায় চলিয়া গেলে। তোমার লীলার শেষ নাই। তুমি মথুরায় গিয়া মাতুলবংশ রাজাকে ধ্বংস করিয়া তোমার ব্রজের বেশ ধড়া চূড়া মোহন-বাঁশী পরিত্যাগ করিয়া লাল পাগড়ি জামা যোড়া পরিয়া মথুরার রাজা হইয়া রাজসিংহাসনে বসিয়াছিলে।

হে অধিকারী মহাশয়, তোমার সংসার যাত্রায় তুমি আসিয়া কত প্রকার সাজ সাজিয়া পৃথিবী ধন্য করিয়াছ। তোমা লীলা তোমার মন তুমি জান, অন্যে কে জানিবে?

অধিকারী মহাশয়, এই প্রকার রাজা হইয়া কিছু দিবস মথুরায় থাকিয়া, পরে তুমি সংসারী হইয়া, বিবাহ করিয়া, স্ত্রী পুত্র কন্যা সংসারে যত প্রয়োজন, দ্বারকা লীলায় সে সমুদায় বাসনা পূর্ণ করিয়াছ। হে অধিকারী মহাশয়, তুমি ছাপ্পান্ন কোটী যদুবংশ একেবারে সাজিয়া দাঁড়াইলে। তখন তুমি দেখিলে যে তোমার সংসারযাত্রায় তোমার বংশাবলী লইয়া দাঁড়াইতে আর স্থান থাকিল না।

অধিকারী মহাশয়, তুমি ইচ্ছাময়। তোমার যখন যাহা ইচ্ছা তখন তাহাই হয়। তখন তোমার ঐ ছাপ্পান্ন কোটী যদু-বংশ তুমি একেবারে ধ্বংস করিয়া, তুমি যে সাজে আসরে দাঁড়াইয়া ছিলে সেই সাজটী পরিত্যাগ করিয়া, হাত পা ধুইয়া, আবার অধিকারী মহাশয় হইয়া তোমার যাত্রার আসরে আসিয়া দাঁড়াইলে। অধিকারী মহাশয়, তোমার লীলা অনন্ত অপার! তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম, আমাকে ঐ চরণে স্থান দিও।

সংসার যাত্রা।

—o—

ত্রয়োদশ রচনা।

ওহে কৃষ্ণ রাধাকান্ত, কে জানে তোমার অন্ত,
তুমি আদি অন্তের অন্তর্যামী।
পুরাণেতে আছে ব্যক্ত, ভবাদি স্তবে অশক্ত,
নারী জাতি কি জানিব আমি॥

দেহ ইন্দ্রিয় আছে যত, তব চরণে অর্পিত,
জ্ঞান ব্রত, তুমি যজ্ঞ দান।
না জানি ভকতি স্তুতি, অবলা অজ্ঞান মতি,
তুমি হে সম্বল ধন প্রাণ॥
ভরসা ঐ পদারবিন্দু, অধম তারণ দীনবন্ধু,
ভবসিন্ধু করহে উদ্ধার।
তব নাম কৃপালেশে, সলিলে পাষাণ ভাসে,
শিলা হতে আমি কত ভার॥
তুমি ভকতবৎসল, ভকত জনার বল,
ভক্তাধীন নাম হৃষীকেশ।
কিন্তু তাই ভাবি মনে, আমি পাব কোন্ গুণে,
নাহি মম প্রেম ভক্তিলেশ॥
তথাপি মনের সাধ, পূরাইতে হবে নাথ,
কৃপাসিন্ধু হে রাধারমণ।
বহুদিন অভিলাষী, রাসসুন্দরী দাসের দাসী,
দিতে হবে যুগল চরণ।

হে অধিকারী মহাশয়, তোমার সেই শ্রীবৃন্দাবনের ধড়া চূড়া মোহনবাঁশী, সেই ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম বাঁকা রূপটী, সেই কৃষ্ণচন্দ্রের পালাটী সমাধা করিয়া তুমি আর কি নূতন নূতন পালা করিবে সেইটী স্থির করিয়াছিলে।

যখন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরযুগ পরিবর্তন হইয়া কলিযুগ প্রবর্ত্তন হইল, অধিকারী মহাশয়, সেই সঙ্গে তুমি তোমার সংসার যাত্রায় আসিয়া শচীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র হইয়াছিলে এবং এবার তুমি সম্পূর্ণ নূতন নাম ধারণ করিয়া

সেই তারকব্রহ্ম হরিনাম সঙ্গে করিয়া তোমার এই সংসার যাত্রায় আসিয়াছিলে। হে অধিকারী মহাশয়, এই গৌরাঙ্গচন্দ্র নামটী ধারণ করিয়া তোমার সেই হরিনাম সংকীর্ত্তন জগতে প্রকাশ করিয়া ঐ হরি নাম দিয়া জগতের দীন, দুঃখী, পাপী, তাপী, অন্ধ, অতুর সকলকে উদ্ধার করিয়াছিলে। এখনও তোমার সেই হরিনামের ধ্বজা উড়িতেছে।

অধিকারী মহাশয়, তুমি যে কোন্ সাজটী সাজিয়া তোমার যাত্রায় আসিয়া দাঁড়াইবে তাহা অন্যে কে জানিবে, তোমার মন তুমিই জান। তোমার সেই যে ব্রজের বেশ বাঁকা রূপ, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা, ধড়া চূড়া মোহনবাঁশী সেরূপ কোথা লুকায়েছ?

গীত।

ছিল কালবরণ বাঁকা রূপ ত্রিভঙ্গ,
নদে এসে হয়েছ হে গৌরবরণ গৌরাঙ্গ।
(হে ব্রজনাথ তোমার ব্রজের চিহ্ন কিছুই নাই হে)
কোথা লুকায়েছ সে অঙ্গ, হলে কাঁচা সোণা গৌরবরণ গৌরাঙ্গ।
হে ব্রজনাথ, ব্রজে রাধা বলি বাঁজাতে বাঁশী
এখন হরি বলে বাজাও মৃদঙ্গ॥

হে অধিকারী মহাশয়, এই কলিযুগে তোমার সেই কালবরণ রাই রূপেতে গিল্টি করা হইয়াছে, এখন তুমি তোমার যাত্রার আসরে আসিয়া গৌরচন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছ।

হে অধিকারী মহাশয়, তুমি কিছু দিবস নবদ্বীপে শচীনন্দন হইয়া ছিলে, তোমার নাম ছিল নিমাই পণ্ডিত, ঐ সময়ে একটী দিগ্বিজয়ী

পণ্ডিত জয়পত্র লইতে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। তখন তুমি সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে জয় করিয়াছিলে।

পণ্ডিতকে জয় করে হৈল নামে ধ্বনি।
নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি॥

এই প্রকার নবদ্বীপে কিছুদিন সংসারী হইয়া ছিলে। পরে তোমার সে বেশটি পরিত্যাগ করিয়া, সুন্দর চাঁচরকেশ তোমার শিরে ছিল সেই কেশ মুণ্ডন করিয়া, পট্টবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ডোর কৌপীন পরিয়া দণ্ড কমণ্ডলু হস্তে ধারণ করিয়া সন্ন্যাসীর সাজ সাজিয়া দাঁড়াইয়াছিলে; তখন তোমার নাম হইল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

হে অধিকারী মহাশয়, যখন প্রথমে তুমি তোমার যাত্রার আসরে আসিয়া দাঁড়াইলে, তখন তুমি ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলিয়া তোমাকে সকলে মান্য করিত ও প্রণাম করিত। পরে যখন তুমি সন্ন্যাসী হইয়া দাঁড়াইলে তখন তোমার নাম হইল শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামটি জগতে বিখ্যাত হইল, আর তখন তোমাকে সকলে সন্ন্যাসীঠাকুর বলিয়া মান্য করিতে লাগিল।

অধিকারী মহাশয়, তোমার মাতা শচীঠাকুরাণী ও তোমার ঘরণী বিষ্ণুপ্রিয়া, ইহাঁদিগকেও পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলে।

চতুর্দ্দশ রচনা।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর পরে, যুগধর্ম্ম অনুসারে,
সদর্পেতে কলি রাজা হয়।
সাধুকে না করে গণ্য, পাপে পূর্ণ মতিচ্ছন্ন,
ঘোর কলি অন্ধকারময়॥
কলি রাজা আগমনে, সঙ্গে সৈন্য অগণনে,
পাপ, তাপ, ক্রোধ, হিংসা যত।

উড়িল কলির ধ্বজা, শাসনে রহিল প্রজা,
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যাগ, যজ্ঞ হত ॥
জীবের দুর্দ্দশা হেরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
শচী গর্ভে হইলা উদয় ।
মোহাবর্ত্ত হৈল নাশ, ত্রিজগতে উল্লাস,
জগভরি হরিধ্বনি হয় ॥
এলে হরিনাম সঙ্গ, রঙ্গে ভঙ্গে গৌরসিংহ,
হুহুঙ্কার বিশাল গর্জ্জনে ।
নাম দাপে যম কাঁপে, কলির দর্প হইল খর্ব্ব
কলি রহিল সশঙ্কিত মনে ॥
ভক্তে অনুগ্রহ করি, ভকতবৎসল হরি,
নামামৃতে ভাসালে অবনী ॥
হরি নাম সংকীর্ত্তনে, আনন্দিত ত্রিভুবনে,
গগন ভেদিয়া হরিধ্বনি ॥
পেতে হরিনামের খেলা, মাতালে মাতালে মেলা,
হাসে কান্দে নাচে উভরায় ।
নিজ নামানন্দে মত্ত, না জানি আপন তত্ত্ব,
হরিনাম জীবেরে বিলায় ॥
বাজে খোল, বীণা বংশী, মাঝে নাচে গৌরশশী,
হরিধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া ।
ব্রজলীলা প্রেমরস, ছিল অতি অপ্রকাশ,
নিজে এসে প্রকাশে নদীয়া ॥
গোলকের প্রেমধন, হরিনাম সংকীর্ত্তন
স্নেহের নাম ছিল গোপনেতে ।
নিজে এসে গৌরহরি, পাগলা নিতাই সঙ্গে করি,
যেচে যেচে বিলায় জগতে ॥

পাপী তাপী ছিল যত　　　হৈল মহা ভাগবত,
ভক্তি তত্ত্ব সদা অধ্যয়ন।
নিজ শাস্ত্র পরিহরি,　　　যবনে বলয়ে হরি,
নাম মদে মাতিল ভুবন॥
ভাসিল ধরণী প্রেমে,　　　তারকব্রহ্ম হরিনামে,
ধন্য ধন্য কলিযুগ ধন্য।
ঐ পদ সতত হেরি,　　　বাঞ্ছা করে রাসসুন্দরী,
পূর্ণ কর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥

হে নাথ পতিত পাবন, হে প্রভু ভক্তবৎসল, করুণাময়, তুমি নবদ্বীপে শচীগর্ভে উদয় হইয়া পৃথিবী ধন্য করিয়াছ। তোমার প্রেম-বন্যায় জগৎ প্লাবিত হইয়াছে। হে প্রভু কৃপাসিন্ধু হরি! তুমি এই কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া গৌরহরি নামটি ধারণ করিয়াছিলে। তাতেও তুমি তোমার সকল জগৎ খণ্ডন করিতে পারিলে না। পরে সন্ন্যাসী হইয়া তুমি সেই সন্ন্যাসীর বেশে ঘরে ঘরে হরিনাম যেচে যেচে পাপী, তাপী, অন্ধ, আতুর সকলকে দিয়াছ। হে গৌরকিশোর, আমি নরাধম তোমাকে চিনিনা, তোমাকে ডাকিতেও জানি না।

হে প্রভু গৌরকিশোর, তোমার এই সংসার যাত্রার তুমি অধিকারী মহাশয়। আমাকে ৮৫ বৎসর পর্য্যন্ত তোমার যাত্রার আসরে বসাইয়া রাখিয়াছ। আমি একাশনে ৮৫ বৎসর বসিয়া তোমার আশ্চর্য্য কাণ্ড মাণ্ড সমস্ত দেখিতেছি। হে প্রভু দয়াময়, তুমি দয়া করিয়া ৮৫ বৎসর নিরাপদে আমাকে জীবিত রাখিয়াছ। এপর্য্যন্ত আমার দশ ইন্দ্রিয়ের কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই, একমত সব চলিতেছে।

হে অধিকারি মহাশয়, আমি যদি রোগাচ্ছন্ন হইতাম, তাহা হইলে ৮৫ বৎসর পর্য্যন্ত আমার উত্থানশক্তি থাকিত না, শয্যাগত হইতাম। তাহা হইলে আমার জীবন্মৃত্যু হইত।

হে নাথ দয়াময়, হে দুর্ব্বলের বল, হে বিপদভঞ্জন, হে অধম তারণ, তুমি এই অধিনীর প্রতি সদয় হইয়া ৮৫ বৎসর আমাকে নিরাপদে জীবিত রাখিয়াছ। আমার শেষ কাণ্ডে তুমি কি কাণ্ড করিবা তাহা তুমি জান। হে গৌরকিশোর, আমার অন্ত বিষয় যাহা কর সে ভাল, কিন্তু আমার শেষের সময় নিজগুণে দয়া করে শ্রীচরণে স্থান দিতে হবে।

পঞ্চদশ রচনা।

কলি যুগ করি ধন্য, নবদ্বীপে অবতীর্ণ,
সাঙ্গ পাঙ্গ গৌরাঙ্গসুন্দর।
আর কি ভাব উদয় মনে, মায়াপুরে তুলসী বনে,
হয়েছ হে গৌরকিশোর!
নবদ্বীপ ত্যাজ্য করি, সন্ন্যাসীর বেশ ধরি,
জগন্নাথে ছিলা অধিষ্ঠান,
তাহাতে করিয়া কুহ, নিগমে গোপনে রহ,
বেদ বিধি না পায় সন্ধান।
তুমি না জানালে জানে, কে আছে এ ত্রিভুবনে,
ছিন্ন ভিন্ন হইল মেদিনী,
জীবে হ'য়ে কৃপাবান, শমনে করিতে ত্রাণ,
নিজগুণে প্রকাশ আপনি।
কিশোর কিশোরী রূপ, মায়াপুরে অপরূপ,
পুনরপি হয়েছ যুগল,

হেরিয়ে ভকতগণ, আনন্দে হ'য়ে মগন,
কান্দে, নাচে, বলে হরিবোল।
তুমি প্রভু ইচ্ছাময়, যখন যে ইচ্ছা হয়,
সেই রূপ দাঁড়াও সাজিয়া,
রাম সুন্দরীর মনোগত, তব পদে অবিরত,
লেগে থাকি চন্দন হইয়া।

—•—

ষোড়শ রচনা।

আজি আমি কি অপরূপ দেখেছি স্বপন।
আজি যেন গিয়াছি সেই বৃন্দাবন॥
দেখিলাম সেই কৃষ্ণ নিকুঞ্জ কাননে।
চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়াছে সব সখীগণে॥
ধড়া চূড়া ব্রজের বেশ বাঁধা রয়েছে।
বনফুলের মোহনমালা গলে দুলিছে॥
নবীন নীরদ জিনি শরীরের শোভা।
কোটি পূর্ণচন্দ্র জিনি প্রভা মনোলোভা॥
মালতী মালাতে বদ্ধ চূড়া সমুজ্জ্বল।
কৌস্তুভ মণিতে আলো করে বক্ষস্থল॥
প্রফুল্ল পঙ্কজ জিনি যুগল নয়ন।
চন্দন চর্চ্চিত অঙ্গে রত্ন বিভূষণ॥
রূপেতে গন্ধর্ব্ব দর্প করিয়াছে জয়।
ভুবন মোহন রূপ রূপেরি আলয়॥
কিসেতে তুলনা দিব নাহি সমতুল।
চরণকমল দলে কত চাঁদের ফুল॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ বামেতে কিশোরী।
ভক্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ রূপ মনোহারী॥

যুগল কিশোর রূপ হেরিয়া নয়নে।
চন্দন তুলসী পুষ্প দিতেছি চরণে॥
স্বপনে এরূপ হেরি প্রফুল্ল হৃদয়।
রাসসুন্দরী বাঞ্ছা পূর্ণ কর দয়াময়।

১২১৬ সালে চৈত্রমাসে আমার জন্ম হইয়াছে, এক্ষণে ১৩০৩ সাল আমার বয়ঃক্রম ৮৫ বৎসর, আমার ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত শরীরের অবস্থা এবং মনের অবস্থা আমার জীবনের সমুদয় বৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। এদিকে আর ২৫ বৎসর আমার জীবনের বৃত্তান্ত লেখার দরকার বটে। এক্ষণে আমার শরীরের অবস্থা যে প্রকার হয়েছে সে বিষয় কিঞ্চিৎ লিখিত হয়েছে। আর অধিক কি বলিব। যিনি আমার অন্তরে সততই বিরাজমান রহিয়াছেন, তিনি আমার মনের অবস্থা সব বিলক্ষণ রূপে জানিতেছেন।

সংসারী বিষয় ভাল মন্দ লোকের যাহা কিছু হইয়া থাকে, সে সমুদয় এক প্রকার সকলই হইয়াছে। সংসারের সম্পত্তি পুত্র কন্যা পৌত্র দৌহিত্র এই দিকে যাহা যাহা প্রয়োজন তাহা জগদীশ্বর দয়া করে সব দিয়াছিলেন, এখন তিনি কতক কতক নিয়াছেন। দশটি পুত্র দুইটি কন্যা এই বারটি সন্তান আমার জন্মিয়াছিল। তাহা হইতে ছয়টি পুত্র একটি কন্যা এই সাতটি সন্তান তিনি আমাকে দেখাইয়া লইয়া গিয়াছেন। অবশিষ্ট চারিটি পুত্র একটি কন্যা আমার সম্মুখে রাখিয়া দেখাইতেছেন।

আমার জীবন-চরিত দ্বিতীয়ভাগ এই পর্য্যন্তই ক্ষান্ত থাকিল। আমার জীবনান্ত হইলে আমার বংশের মধ্যে যিনি ইচ্ছা করেন তিনি আমার শেষ ভাগ লিখিবেন।

এই বইখানি আমার নিজ হস্তের লেখা। আমি লেখা পড়া

কিছুই জানি না। পাঠক মহাশয়েরা, তোমরা যেন অবহেলা না কর, দেখিয়া ঘৃণা করিও না। অধিক লেখা বাহুল্য। তোমরা সব জান, যাহাতে পরিশ্রম সফল হয় করিবা।

আমার এই বইখানি ছাপান হইলে ঐ বই বিক্রয় হইয়া ছাপানর দাম দিয়া পরে যে কিঞ্চিৎ থাকিবে ঐ টাকা আমানত থাকিবেক। আমার ছেলেদের ত কথাই নাই। পরে আমার বংশের মধ্যে যে থাকিবেক, প্রতি বৎসর মদনগোপালের নিকট ঐ টাকা দিয়া মহোৎসব হইবেক এই আমার প্রার্থনা।

মনঃ শিক্ষা।

মনরে আমার, আমি তোমার, তোমায় আপন জানি।
আমার দেহের মধ্যে তুমি প্রবল, আর সব নিছুনি॥
এই ভবে আসা তোর ভরসা, তোমার করি জোর।
তুমি ভবের মেলায় ধূলার খেলায় করলে বাজি ভোর॥
এই মিছা ধন জন, করিছ যতন, সকলি পড়িয়া রবে।
ভেবে দেখ মন একাই এসেছ, একাই যাইতে হবে॥
এই যে নিজ পরিবার করে আপনার, পালিছ জনম হ'তে।
শমন ভবন গমনকালে কেহত যাবেনা সাথে॥
এই মিছা ধন জন, পরের কারণ, যতন করিয়া মর।
যদি পেয়েছ দুর্ল্লভ মানব জনম তাহার কর্ম্ম কর॥
জীব আইসার কালে জীবেরে প্রভু আজ্ঞা করেছিল।
ভারতবর্ষে জন্ম নিয়া চারি কর্ম্ম কর॥
করিও জ্ঞান কর্ম্ম, গুরুর আজ্ঞা সত্য করি মান।
পুণ্য কথা যথা তথা শ্রবণে ভরে শুন॥

অভ্যাগতে নিষ্ঠভাবায় অন্ন দিয়া খেও।
সাক্ষী দিতে সত্য বিনা মিথ্যা না বলিও ॥
চারি কর্ম্মের কোন কর্ম্ম করি নাই আমি।
যখন জিজ্ঞাসিবেন এই বলিয়া সাক্ষী দিবে তুমি॥
জাননা জন্ম যখন মৃত্যু যখন সেই বা কেমন দিন।
যেমন কাল দিঘীতে বেড়ীবে জালে জলের মধ্যে মীন ॥
তখন ত জানতে পাবে কারবা কেবা কার লেগে কে মরে॥
ঘরের বাহির হতে শমন বাঁধিবে হাতে গলে।
জ্ঞাতি বন্ধু যারা বলিবে তারা কেন বিলম্ব কর ?
যার প্রেম তার সঙ্গে গেল শীঘ্র নিয়া চল।
অঙ্গের বসন ভূষণ অঙ্গাভরণ গৌরব করে সবে।
যাবার বেলা ছিন্ন বস্ত্র তাইবা কোথা রবে॥
এই যে নারীর সঙ্গে প্রেম তরঙ্গে ভেসেছ দিবানিশি।
তখন কার রমণী কোথা রবে মিছা ধন্ধবাজি ॥
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে তত্ত্ব নাহি জান।
এ দেহ অনিত্য, চিত্তে সত্য করিমান॥
দেহের যতন করিছ কত পুড়ে ভস্ম হবে।
ইহা দেখে শুনে যে না বুঝে ধিক্ থাকুক সে জীবে।
এই জীবের কথা বলে বৃথা কাব্য করে মরি॥
অন্তকালে ধন্ধবাজি ঐ নিবেদন করি॥
এই যে হাতি ঘোড়া শালের যোড়া সকলি পড়ে রবে।
তুলিয়া বাঁশের খাটে শ্মশান ঘাটে নিয়া বিদায় দিবে॥
কতকগুলি তৃণ কাষ্ঠ অনলে সাজাইয়া।
পুত্র কন্যা ঘরে যাবে শ্মশানে রাখিয়া ॥

শ্মশানে অনলরাশি ভস্মবাসি শমন ভবন যেতে।
সঙ্গে যাবে কালের কোটাল, কেউ যাবেনা সাথে॥
কোটালের ডাণ্ডা হাতে মারবে মাথে বলবে চল দুরাচার পাপী।
তখন পড়বে কেঁদে, তুলবে বেঁধে, করবে ছোটা বাজী॥
তখন নয়ন তুলে দেখবে চেয়ে, কেউ নিকটে নাই।
মনরে কার বেগায় খেটে এলাম কি ধন নিয়ে যাই॥
কোথা হতে কার নিকটে কেন লয়ে যায়।
আপনে বলিয়া যারে ভাবিলাম সেবা কোথা রয়॥
বড় বাড়ী বড় ঘর রহিল পড়িয়ে।
যেন হাট ভাঙ্গিলে কে কোথা যায় কেউ দেখেনা চেয়ে॥
ভাই বন্ধু আর পরিবার সম্পত্তির সাথী।
শমন ভবন গমন কালে কেবল গোবিন্দ সারথী॥
ধন জন পুত্র কন্যা সব অকারণ।
মরণ সময় কেবল আছেন শ্রীমধুসূদন॥
ওহে বিপদবারি, [illegible] সুন্দরী ভেবে ব্যাকুল মন।
রাসসুন্দরীর সেই সময়ে দিও হে দর্শন॥

সমাপ্ত।